চতুর্থ অধ্যায়

রবীন্দ্র-উপন্যাসের আখ্যানতাত্ত্বিক বাচনশৈলী

ক) কথনরীতি

খ) দৃষ্টিকোণ

গ) ভাষা ব্যবহার

সন্দর্ভপত্রের পূর্বের অধ্যায়গুলির আলোচনা থেকে জানতে পেরেছি যে আখ্যানতত্ত্বের আলোকে উপন্যাসের গঠন বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে শিল্পিত স্তরের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। এই স্তরের মাধ্যমেই শিল্পপূর্ব স্তরের বিষয়বস্তুকে ফুটিয়ে তোলা হয়, প্রকাশ করা হয় ভাষার মাধ্যমে। এবং এই কারণে আখ্যানতাত্ত্বিকেরা একে 'Representation'-এর স্তর হিসেবে অভিহিত করেছেন। এই স্তরের অন্যতম অবলম্বন হল বাচনকৌশল, এবং সেই বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েই সন্দর্ভপত্রের এই অধ্যায়ের নামকরণ হয়েছে 'রবীন্দ্র-উপন্যাসের আখ্যানতাত্ত্বিক বাচনশৈলী'। বাচন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা প্রদান করতে গিয়ে সেম্যুর চ্যাটম্যান তাঁর 'Story and Discourse' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন;

> "What in Narrative is the province of expression? Precisely the narrative discourse. Story is the content of the narrative expression, while discourse is the form of that expression. We must distinguish between the discourse and its material manifestation— in words, drawing or whatever. The latter is clearle the substance on narrative expression, even where the manifestation is independently a semiotic code." (Chatman. 1980. p. 23-24)

আখ্যানতত্ত্বের বিভাগগুলি সম্পর্কে বলতে গেলে বাচনস্তরটিই আখ্যান প্রকাশের মুখ্য স্তর হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। 'কাহিনি' হল আখ্যান-প্রকাশের বিষয় এবং বাচন হল তার গঠনরীতি। এই প্রাথমিক বিভাগ এবং তাদের সম্ভাব্য আবশ্যিক উপবিভাগগুলি নিয়ে সন্দর্ভপত্রের প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। উপন্যাসের বাচনশৈলী নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি বিশেষভাবে গুরুত্ব পায় সেগুলি হল কথনরীতি, দৃষ্টিকোণ এবং ভাষা উপাদান। অর্থাৎ উপন্যাসের আখ্যানবিশ্বে কে বলছে, কে দেখছে, কীভাবে বলছে প্রভৃতি নানা বিষয় প্রাধান্য পেয়ে থাকে। আলোচনার সুবিধের জন্য বর্তমান অধ্যায়টিকে তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। আলোচ্য অধ্যায়ের তিনটি পরিচ্ছেদ হল;

ক) কথনরীতি (Narration)

খ) দৃষ্টিকোণ (Focalization)

গ) ভাষা ব্যবহার (Speech)

ক) কথনরীতি

আখ্যানের কথনরীতি নিয়ে আলোচনার শুরুতেই বলতে হয় আখ্যান-সঞ্চরণের এই 'কথক'-এর সঙ্গে যুক্ত থাকে শ্রোতা বা পাঠকের সম্পর্ক। কথকের থেকে তথ্য কীভাবে পাঠক বা শ্রোতার মধ্যে সঞ্চারিত হয় তা নিম্নের রেখাচিত্রটির মাধ্যমে দেখানো যায়,

Real Author → Implied author → (Narrator)→ (Narratee)→ Implied reader→ Real reader

(Chatman. 1980 P. 151)

এই রেখাচিত্রটির মধ্যে থেকে বিশেষ কিছু উপাদান গ্রহণ করে কোনো কোনো আখ্যানতাত্ত্বিক আখ্যান-সঞ্চরণের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। আবার কেউ কেউ সম্পূর্ণ রেখাচিত্রটিকেই গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে সন্দর্ভপত্রের প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে (বিস্তারিত আলোচনা পৃ. ৩৮-৪৭)।

আখ্যানতত্ত্বের প্রাথমিক ধারণা নিয়ে যখন উপন্যাসের কথনরীতির আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যায় তখন যে দুটি প্রশ্ন সবার প্রথমে উঠে আসে তা হল কাহিনির ঘটনাগুলো 'কে দেখছে' (who sees) এবং 'কে বলছে' (who speaks)। আখ্যানে এই দেখা এবং বলার কাজ একই ব্যক্তির দ্বারা একই সময়ে হতে পারে আবার নাও হতে পারে। সন্দর্ভপত্রের প্রথম অধ্যায়ের আলোচনা থেকে জানা গিয়েছে আখ্যানে যে ব্যক্তি ঘটনাগুলি দেখে সে 'নিরীক্ষক' (focalizer) এবং পুরো বিষয়টিকে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ রূপে সাজিয়ে যে ব্যক্তি উপস্থাপনা করে সে 'কথক' (narrator)।

কথকের অবস্থান এবং কাহিনি উপস্থাপনের ধরনের ওপর নির্ভর করেই গড়ে ওঠে কথনরীতি। এই কতকগুলি সহজ বিষয় এবং প্রশ্নের উত্তর বুঝে নেওয়ার পরে সরাসরি পরিচ্ছেদের মূল আলোচনা ক্ষেত্রে প্রবেশ করা যায়। যেখানে আলোচ্য অধ্যায়ের এই প্রথম পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির কথক এবং কথনরীতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গিয়েছে সেখানে পরিচ্ছেদটিকে মূলত দুটি পর্যায়ে ভাগ করে আলোচনার চেষ্টা করা হবে; যথা—

অ. কথকের নানান রূপভেদ (বিস্তারিত আলোচনা পৃ. ৩৯-৪২)

আ. কথনরীতি। (বিস্তারিত আলোচনা পৃ. ৪৩-৪৭)

এই পরিচ্ছেদের আলোচনা মূলত জেরার্ড জেনেটের গ্রন্থটির নিরিখে করা হবে, কারণ দেখা গিয়েছে রিমন কেনান বা সেম্যুর চ্যাটম্যানের মতো অধিকাংশ আখ্যানতাত্ত্বিকই জেনেটকৃত কথক এবং কথনরীতির নানান বিভাগগুলিকে মান্যতা দিয়েই তাঁদের আলোচনাকে অগ্রসর করেছেন।

(অ) কথকের নানান রূপভেদ:— প্রথম অধ্যায়ের আলোচনা থেকে জানা গিয়েছে জেরার্ড জেনেট তাঁর গ্রন্থের পঞ্চম তথা 'Voice' শীর্ষক অধ্যায়ে কথক ও কথনরীতিকে নানান ভাবে বিভক্ত করেছেন। তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই অধ্যায়ের 'Person' নামাঙ্কিত পরিচ্ছেদে কথকের নানান রূপভেদ নিয়ে জেনেট আলোচনা করেছেন।

আখ্যানের কথকের উপস্থিতির স্পষ্টতা এবং অস্পষ্টতার নিরিখে জেনেট কথককে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা;

১. প্রকাশ্য কথক (Explicit Narrtor)

২. ছদ্ম কথক (Implicit Narrator) (Genette. 1983. P. 244)

জেনেটকৃত কথকের এই দুই ধরনকেই আবার রিমন কেনান তাঁর গ্রন্থে 'Overt Narrator' এবং 'Cover Narrator' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন (বিস্তারিত আলোচনা পৃ. ৩৯-৪২)।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির কথকদের উক্ত স্পষ্টতা এবং অস্পষ্টতার নিরিখে বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যাবে 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' থেকে শুরু করে 'গোরা' হয়ে 'যোগাযোগ' পর্যন্ত যেখানে কথকের উপস্থিতি অতি স্পষ্ট সেখানে 'শেষের কবিতা' থেকে আরম্ভ করে অন্তিমপর্বের ক্ষুদ্রাকার উপন্যাসগুলিতে কথকের উপস্থিতির প্রতীয়মানতার মাত্রা ক্রমে ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে। উপন্যাসগুলি থেকে কিছু অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করে বিষয়টিকে সম্যকরূপে বুঝে নেওয়া যায়।

> **১. বউ-ঠাকুরানীর হাট:—** "উপাখ্যানের আরম্ভভাগে রুক্মিণীর উল্লেখ করা হইয়াছে, বোধ করি পাঠকেরা তাহা বিস্মৃত হন নাই। এই মঙ্গলাই সেই রুক্মিণী।" (ঠাকুর। ১৪২৫।পৃ. ৫২) (পাঠককে সম্বোধন)

২. রাজর্ষি:— "গোবিন্দমাণিক্য যে ঠিক এতটা ভাবিয়াছিলেন তাহা নহে। তিনি লক্ষণ দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন যে, এই ফকির, এ যে আপনার বাসনা-সকল বিসর্জন দিয়া স্বাধীন ও সুস্থ হইয়া জগতের কাজকরিতে বাহির হইয়াছে তাহা নহে; এ কেবল আপনার বাসনা তৃপ্ত হয় নাই বলিয়া রাগ করিয়া সমস্ত জগতের প্রতি বিমুখ হইয়া বাহির হইয়াছে।" (পৃ. ১৭৯) (চরিত্র কতটা ভেবেছে বা ভাবেনি তার মাত্রা নির্ণয়)

৩. চোখের বালি:— ক. "বলিয়া উত্তরমাত্র না শুনিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন।" (পৃ.১৯১) (চরিত্রের শারীর-ভাষার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা)
খ. "যখন কোনো অভিভাবক একটা ইক্ষুদণ্ডের সমস্ত রস প্রায় নিঃশেষপূর্বক চর্বণ করিতে থাকে তখন হতাশ্বাস লুব্ধ বালকের ক্ষোভ উত্তরোত্তর যেমন অসহ্য বাড়িয়া উঠে, মহেন্দ্রে সেই দশা হইল।" (পৃ. ১৯৬) (চরিত্রের ভাবনার নিরিখে বিশেষ টিপ্পনী)

৪. নৌকাডুবি:— "নৌকা গ্রাম ছাড়াইয়া চলিয়া গেল। এক দিকে চর ধূ ধূ করিতেছে, আর-এক দিকে ভাঙা উচ্চ পাড়। কুহেলিকার মধ্যে চাঁদ উঠিল, কিন্তু তাহাকে মাতালের চক্ষুর মতো অত্যন্ত ঘোলা দেখাইতে লাগিল।" (পৃ. ৩৩৯) (সংস্থান বর্ণনার পাশাপাশি রূপকের ব্যবহারের মাধ্যমে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীতার অধ্যাস গড়ে তোলা)

৫. গোরা:— "সাধারণত আমাদের দেশের লোকেরা স্বজাতি ও স্বদেশের আলোচনায় কিছু-না-কিছু মুরুব্বিয়ানা ফলাইয়া থাকে; তাহাকে গভীর ভাবে সত্য ভাবে বিশ্বাস করে না; এইজন্য মুখে কবিত্ব করিবার বেলায় দেশের সম্বন্ধে যাহাই বলুক দেশের প্রতি তাহাদের ভরসা নাই; ..." (পৃ. ৫৪২) (পাঠককে বক্তব্যের মধ্যে যুক্ত করে নেওয়া)

৬. চতুরঙ্গ:— "তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদের শূণ্যতা প্রথমটা শচীশের কাছে যে কেমনতরো ঠেকিয়াছিল তা ভাবিয়া ওঠা যায় না। সেই অসহ্য যন্ত্রণার দায়ে শচীশ কেবলই বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিল যে, শূন্য এত শূন্য কখনোই হইতে পারে না; সত্য নাই এমন ভয়ংকর ফাঁকা কোথাও নাই; এক ভাবে যাহা 'না' আর-এক ভাবে তাহা যদি 'হাঁ' না হয় তবে সেই ছিদ্র দিয়া সমস্ত জগৎ যে গলিয়া ফুরাইয়া যাইবে।" (পৃ. ৮১১) (চরিত্রের একান্ত ব্যক্তিগত ভাবনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ প্রদান যা সর্বজ্ঞ-কথক ব্যতীত সম্ভব নয়)

৭. ঘরে-বাইরে:— "ওরে হতভাগা, একবার জগতের সদরে দাঁড়িয়ে সমস্তর সঙ্গে আপনাকে মিলিয়ে দেখ-না সেখানে যুগযুগান্তের মহামেলায় লক্ষকোটি লোকের ভিড়ে বিমল তোমার কে? সে তোমার স্ত্রী! কাকে বল তোমার স্ত্রী? ঐ শব্দটাকে নিজের ফুঁয়ে ফুলিয়ে তুলে দিন রাত্রি সামলে বেড়াচ্ছ, জানো বাইরে থেকে একটা পিন ফুটলেই এক মুহূর্তে হাওয়া বেরিয়ে গিয়ে সমস্তটা চুপসে যাবে।" (পৃ. ৮৮০) (যৌগিকরীতির আত্মকথনের একজন কথক স্বগতোক্তির মাধ্যমে নিজের ভাবনাকে বিশ্লেষণ করছে)

৮. যোগাযোগ:— "যারা মারে তারা ভোলে, যারা মার খায় তারা সহজে ভুলতে পারে না, লাঠি তাদের হাত থেকে খসে পড়ে বলেই লাঠি তারা মনে মনে খেলতে থাকে। বহু দীর্ঘকাল হাতটা অসাড় থাকাতেই মানসিক লাঠিটা ওদের বংশ বেয়ে চলে আসছে।" (পৃ. ৯৭০) (উপন্যাসের মূল দ্বন্দ্ব সম্পর্কে কথকের টিপ্পনী)

৯. শেষের কবিতা:— "এইখানে একবার পিছন ফেরা চাই। পশ্চাতের কথাটা সেরে নিতে পারলে গল্পটার সামনে এগোবার বাধা হবে না।" (পৃ. ১১১৬) (কাহিনির গতি থামিয়ে সর্বজ্ঞ-কথকের সুরে মন্তব্য)

১০. দুই বোন:— "মেয়েরা দুই জাতের, কোনো কোনো পণ্ডিতের কাছে এমন কথা শুনেছি।
এক জাত প্রধানত মা, আর-এক জাত প্রিয়া।" (পৃ. ১১৭৮) (কথকের দ্বারা সাধারণীকরণ)

ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস রচনার একদম প্রথম পর্যায়ের দুটি উপন্যাসের ভাব, ভাষা, পরিবেশন পদ্ধতি বহুলাংশে পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস রচনার পদ্ধতিকে আদর্শ করে রচিত হয়েছিল তা সন্দর্ভপত্রের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়ের নানান অংশের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। পরিচ্ছেদের এই অংশে যেখানে আখ্যান-কথকের আখ্যানে স্পষ্ট কিংবা অস্পষ্টতার মাত্রা নির্ধারণের চেষ্টা করা হচ্ছে সেখানে উক্ত অনুচ্ছেদগুলির প্রতি মনোযোগ রেখে বলা যায় উপন্যাসগুলিতে আখ্যান-কথক প্রকাশ্য ধরনের। প্রতিটি উদাহরণ লক্ষ করলে দেখা যাবে, এই প্রতিটি উপন্যাসেই পাঠককে কখনো সরাসরি সম্বোধন (বউ-ঠাকুরানীর হাট, চোখের বালি, দুই বোন), কিংবা আখ্যানে বর্ণিত বিশেষ পরিস্থিতির নিরিখে বিশেষ মন্তব্য (চোখের বালি, নৌকাডুবি, গোরা, যোগাযোগ) কিংবা চরিত্র কতটা ভেবেছে বা ভাবেনি তার মাত্রা নির্ধারণ (রাজর্ষি, চতুরঙ্গ)-এর মাধ্যমে আখ্যান-কথক আখ্যানতলে নিজের অবস্থান অতি স্পষ্ট করে তুলেছে। এই সমস্ত ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কথক আখ্যানে অতিপ্রকট হয়ে ওঠে। কথকের এই ক্রিয়া পাঠককে সচেতন করে তোলে আখ্যান-কথকের উপস্থিতি সম্পর্কে এবং একইভাবে আখ্যান-কথকও এই সমস্ত ক্রিয়ার মাধ্যমে বুঝিয়ে দেয় যে কাহিনিতে বর্ণিত চরিত্রগুলির অতিরিক্ত আরও একটি চরিত্র রয়েছে যে কাহিনিটির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার সমান্তরালে কাহিনিতে উপস্থিত চরিত্রদের ব্যক্তিগত ক্রিয়া, ভাবনা, স্বগতোক্তি

সম্পর্কেও অভিজ্ঞ। সাধারণভাবে কথকের এই অতি স্পষ্টতা সর্বজ্ঞ-কথকের ধরনের প্রতি দিকনির্দেশ করে। যদিও উক্ত উদাহরণের মধ্যে 'চতুরঙ্গ'-কে রাখা হয়েছে, যা সাধারণভাবে আত্মকথনরীতিতে কথিত উপন্যাস বলেই পরিচিত, যেখানে কথক শ্রীবিলাস উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র কিন্তু একমাত্র প্রধান চরিত্র নয়। উক্ত অনুচ্ছেদের মতো একাধিক অনুচ্ছেদ উপন্যাসটিতে রয়েছে যেখানে কথক শ্রীবিলাসের আত্মকথনরীতির মধ্যে বিগর্ভিত হয়েছে সর্বজ্ঞ-কথকের সর্বজ্ঞতা। শ্রীবিলাস যে শচীশের একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতির এতটা পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছে তার মধ্যেই কথক হিসেবে তার অতি-স্পষ্টতা লক্ষ করা যায়। যার মধ্যে সর্বজ্ঞতার ক্ষমতা পরিলক্ষিত হয়। উপন্যাসটির কথনরীতি বিশ্লেষণকালে এ-সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনাকরা হবে।

আবার একইভাবে উল্লেখ করা যায় একদম শেষের দুটি উপন্যাসের প্রসঙ্গকে। ধারাবাহিকতা বজায় রেখে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলি পাঠ করলে অতি সহজেই উপলব্ধি করা যায় একদম শেষ পর্বের দুটি ক্ষুদ্র উপন্যাসে এসে আখ্যান-কথন কিংবা কাহিনির অগ্রগতির ক্ষেত্রে কথকের হস্তক্ষেপের পরিমাণ অনেকাংশে কমিয়ে এনেছেন রবীন্দ্রনাথ। ফলে উপন্যাসগুলি হয়ে উঠেছে একান্তভাবে চরিত্রদের কথোপকথন নির্ভর। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়;

> **১১. মালঞ্চ:—** "ওর মনের মধ্যে যে রস ছিল নিছক মিষ্ট, আজ কেন সে হয়ে গেল কটু; যেমনাজকালকার দুর্বল শরীরটা ওর অপরিচিত, তেমন এখনকার তীব্র নীরস স্বভাবটাও ওর চেনা স্বভাব নয়।" (পৃ. ১২১৫)

> **১২. চার অধ্যায়:—** "দৃশ্য— চায়ের দোকান। তারই একপাশে একটি ছোটো ঘর। সেই ঘরে বিক্রির জন্যে সাজানো কিছু স্কুলকলেজপাঠ্য বই, অনেকগুলিই সেকেণ্ডহ্যাণ্ড। ..."(পৃ. ১২৫১)

'মালঞ্চ'-র ক্ষেত্রে নীরজার মানসিক-পরিস্থিতি এবং তার দৃষ্টিকোণের বিশ্লেষণকালে কথকের স্পষ্টতা কিছুটা লক্ষ করা গেলেও 'চার অধ্যায়'-এর কথক প্রায় সম্পূর্ণভাবেই ছদ্ম প্রকৃতির। এই উপন্যাসে এসে রবীন্দ্রনাথ প্রায় সম্পূর্ণভাবে কথকের উপস্থিতিকে অস্বীকার করার মানসিকতায় এসে পৌঁছেছিলেন বলেই একদম শেষের এই উপন্যাসটি দাঁড়িয়ে রয়েছে মূলত চরিত্রদের কথোপকথনের ওপর। আখ্যানে সংস্থান বর্ণনা যেটুকু

রয়েছে তাকেও কথকের কথনের আধারে না রেখে বর্ণনা করা হয়েছে নাটকের দৃশ্যপটের আধারে, যার ফলস্বরূপ এই উপন্যাসটিকে অনেকেই নাট্যাকারে সজ্জিত বলে মনে করেছেন। এই দুটি উপন্যাসের ক্ষেত্রেই কথক-চরিত্র উপস্থিত, কিন্তু তার উপস্থিতির মাত্রা অন্যান্য উপন্যাসগুলির তুলনায় অনেকাংশে কম বিবেচনা করে এই কথককে ছদ্ম পর্যায়ে রাখা হল।

উক্ত দুটি বিভাগ ছাড়াও জেনেট আখ্যানে কথকের উপস্থিতির নিরিখে আখ্যানকথন এবং আখ্যানকথক এই দুটি ক্ষেত্রকেই দুইভাগে বিভক্ত করেন। যথা—

৩. বি-সমকথনবিশ্বের কথক (Heterodiegetic)

৪. সমকথনবিশ্বের কথক(Homodiegetic) (বিস্তারিত আলোচনা পৃ. ৪১)

এই দুটি বিভাগ সম্পর্কেও প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে, ফলে আলোচনার পুনরুক্তি না ঘটিয়ে সরাসরি মূল আলোচনায় প্রবেশ করা হল।

আসলে আখ্যান যিনি বয়ন করেন তাঁর বয়নশৈলীর উপরেই নির্ভর করে যে তিনি আখ্যানটিকে কীভাবে অথবা কার মাধ্যমে উপস্থাপন করবেন। আখ্যানের লেখক এমন একজন কথকের মাধ্যমে আখ্যানটি উপস্থাপন করতে পারেন যিনি আখ্যানতলের বাইরে থেকে আখ্যানটি বর্ণনা করেন অথবা আখ্যানেরই কোনো মুখ্য বা গৌণ চরিত্রের মাধ্যমেও আখ্যানের কাহিনিটি উপস্থাপন করতে পারেন। আখ্যান লেখকের এই মনোনয়ন বা কথকের বিকল্পের উপর ভিত্তি করেই জেনেট কথক এবং কথনরীতির ক্ষেত্রে দুটি ভাগ করেছেন। উল্লিখিত আখ্যান কথনের প্রথম পরিস্থিতির নিরিখে দেখলে সেই কথক হবেন বি-সমকথনবিশ্বের কথক এবং দ্বিতীয় পরিস্থিতির নিরিখে দেখলে কথক হন সমকথনবিশ্বের। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, ‘বউ-ঠাকুরানীর হাট’, ‘রাজর্ষি’, ‘চোখের বালি’ প্রভৃতি উপন্যাসের কথক এই হিসেবে বি-সমকথনবিশ্বের; কারণ তারা যে কাহিনি উপস্থাপন করে তা তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার আখ্যান নয়। অন্যদিকে ‘ঘরে-বাইরে’, ‘চতুরঙ্গ’-এর কথকেরা সমকথনবিশ্বের কথক ধরনের। এসমস্ত আখ্যানে কথকেরা নিজেদের জীবনেরই নানান অভিজ্ঞতার বিবরণ দান করেছেন, ফলে তারা আখ্যানতলের মধ্যেই অবস্থান করেন।

উক্ত চারটি ধরন ছাড়াও কথনের স্তর এবং কাহিনির সঙ্গে কথকের সম্পর্কের ভিত্তিতে জেনেট কথককে আরও কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেন (বিস্তারিত আলোচনা পৃ. ৪১-৪২)। যথা—

৫. কাহিনি বহির্ভূত + বি-সমকথনবিশ্বের কথক (Extra+ Heterodiegetic Narrator)

৬. কাহিনি-বহির্ভূত + সমকথনবিশ্বের কথক (Extra+Homodiegetic Narrator)

৭. কাহিনি-অন্তর্গত + বি-সমকথনবিশ্বের কথক (Intra+ Heterodiegetic Narrator)

৮. কাহিনি-অন্তর্গত + সমকথনবিশ্বের কথক (Intra+ Homodiegetic Narrator)

এই হিসেবে রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ উপন্যাসের কথকই কাহিনি বহির্ভূত + বি-সমকথনবিশ্বের কথক বা সর্বজ্ঞ-কথক। যেমন, 'বউ-ঠাকুরানীর হাট', 'রাজর্ষি', 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি', 'গোরা' প্রভৃতি উপন্যাসের কথকেরা আখ্যানতলের বাইরে থেকে আখ্যানগুলি বর্ণনা করে। আবার 'চতুরঙ্গ' বা 'ঘরে-বাইরে'- এই দুটি উপন্যাসের কথকেরা উক্ত বিভাজনের নিক্তিতে কাহিনি-অন্তর্গত + সমকথনবিশ্বের কথক; কারণ তারা যে কাহিনিগুলি বর্ণনা করে তারা নিজেরাও সেই বর্ণিত কাহিনিগুলিরই চরিত্র। যদিও 'চতুরঙ্গ'-এর কথক এমন অনেক ঘটনার বর্ণনা করে যেখানে সে নিজে উপস্থিত ছিল না। যেমন উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়;

> ক. "একদিন শীতের দুপুরবেলায় গুরু যখন বিশ্রাম করিতেছেন এবং ভক্তেরা ক্লান্ত, শচীশ কী একটা কারণে অসময়ে তার শোবার ঘরে ঢুকিতে গিয়া চৌকাটের কাছে চমকিয়া দাঁড়াইল। দেখিল দামিনী তার চুল এলাইয়া দিয়া মাটিতে উপুড় হইয়া পড়িয়া মেঝের উপর মাথা ঠুকিতেছে এবং বলিতেছে, পাথর, ওগো পাথর, দয়া করো, আমাকে মারিয়া ফেলো।
> ভয়ে শচীশের সর্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল, সে ছুটিয়া ফিরিয়া গেল।" (ঠাকুর। ১৪২৫। পৃ. ৮১৬)
>
> খ. "চারি দিকে ধূ ধূ করিতেছে, জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই। রৌদ্র যেমন নিষ্ঠুর, বালির ঢেউগুলাও তেমনি। তারা যেন শূন্যতার পাহারাওয়ালা, গুঁড়ি মারিয়া সব বসিয়া আছে।
>
> যেখানে কোনো ডাকের কোনো সাড়া, কোনো প্রশ্নের কোনো জবাব নাই, এমন একটা সীমানাহারা ফ্যাকাশে সাদার মাঝখানে দাঁড়াইয়া দামিনীর বুক দমিয়া গেল।" (পৃ. ৮৩৩)

উক্ত দুটি পরিস্থিতিতে আখ্যান-কথক শ্রীবিলাস নিজে উপস্থিত না থাকলেও দুটি পরিস্থিতির ঐকান্তিক বর্ণনা সে করেছে; আর এই কারণেই এইসমস্ত ক্ষেত্রের কথন হয়ে গেছে কাহিনি বহির্ভূত + বিসমকথন-বিশ্বের কথকের বয়ান। অর্থাৎ, 'চতুরঙ্গ'-তে একই সঙ্গে দ্বিবিধ কথকের সুরের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

বোঝার সুবিধের জন্য কথকের এই নানান বিভাগগুলির ভিত্তিতে রবীন্দ্র-উপন্যাসের কথকদের শ্রেণিবিভাজনটি একটি সারণির মাধ্যমে দেখানো হল।

উপন্যাসের নাম	**কথকের স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতার ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাজন**	**কথনবিশ্বে কথকের উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতির ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাজন**
বউ-ঠাকুরানীর হাট	প্রকাশ্য কথক	বি-সমকথনবিশ্বের কথক
রাজর্ষি	প্রকাশ্য কথক	বি-সমকথনবিশ্বের কথক
চোখের বালি	প্রকাশ্য কথক	বি-সমকথনবিশ্বের কথক
নৌকাডুবি	প্রকাশ্য কথক	বি-সমকথনবিশ্বের কথক
গোরা	প্রকাশ্য কথক	বি-সমকথনবিশ্বের কথক
চতুরঙ্গ	প্রকাশ্য কথক	সমকথনবিশ্বের কথক
ঘরে-বাইরে	প্রকাশ্য কথক	সমকথনবিশ্বের কথক
যোগাযোগ	প্রকাশ্য কথক	বি-সমকথনবিশ্বের কথক

শেষের কবিতা	প্রকাশ্য কথক	বি-সমকথনবিশ্বের কথক
দুই বোন	প্রকাশ্য কথক	বি-সমকথনবিশ্বের কথক
মালঞ্চ	ছদ্ম কথক	বি-সমকথনবিশ্বের কথক
চার অধ্যায়	ছদ্ম কথক	বি-সমকথনবিশ্বের কথক

(আ) কথনরীতি:— সন্দর্ভপত্রের প্রথম অধ্যায়ে কথনরীতির বিভাজনগুলি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে, তাই আলোচনার এই অংশে উপন্যাসগুলির ব্যাখ্যার সুবিধার্থে কথনরীতিগুলি নিয়ে শুধুমাত্র প্রাথমিকস্তরের আলোচনা রাখা হল।

আমরা ইতিপূর্বের আলোচনা থেকে জানি জেরার্ড জেনেট তাঁর গ্রন্থে আখ্যানের সময় ('Time of Narrating') এবং আখ্যানের স্তরের ('Narrative level'.) (বিস্তারিত আলোচনা পৃ. ৪৩-৪৭) উপর ভিত্তি করে কথনরীতিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। আখ্যানের সময়ের উপর নির্ভর করে জেনেট কথনরীতির যে ভাগগুলি করেন তা একটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে নীচে দেখানো হল;

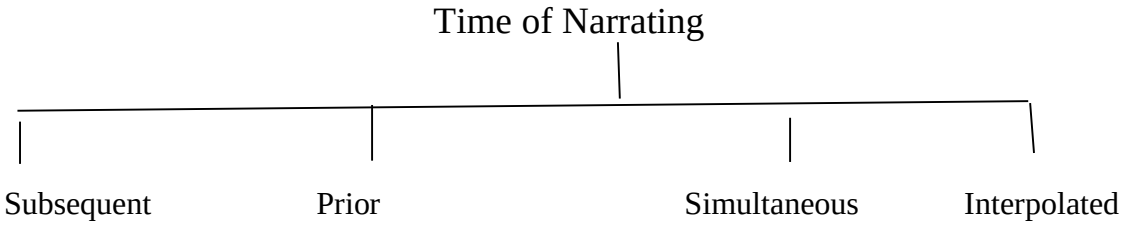

অর্থাৎ, আখ্যানের সময় (Time of Narrating)-এর উপর নির্ভর করে জেনেট কথনরীতির যে ভাগগুলি করেন সেগুলি হল,

১. উত্তরকালীন কথন (Subsequent Narrating)

২. পূর্বতন কথন (Prior Narrating)

৩. সমকালবর্তী কথন (Silumtaneous Narrating)

৪. প্রক্ষিপ্ত বা বিগর্ভিত কথন (Interpolated Narrating) (বিস্তারিত আলোচনা পৃ. ৪৫-৪৬)

রিমন-কেনান জেনেটের উক্ত আলোচনাকে মান্যতা দিয়ে একইভাবে নিজের গ্রন্থের সপ্তম তথা 'Narration: Levels and Voices' শীর্ষক অধ্যায়ের 'Temporal Relations' পরিচ্ছেদে কালিক সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা কথনের নানা শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কিত আলোচনাকালে কথনরীতিকে চারটি ভাগে বিভক্ত করেই আলোচনা করেছেন (Kenan. 1983. P.89-91)।

স্তর হিসেবে কথনের শ্রেণিবিভাগকালে কতকগুলি নির্দিষ্ট পরিভাষার ব্যবহার করেছেন জেনেট, এগুলি হল

৫. বহিঃস্থ কথন (Extradiegetic),

৬. অন্তঃস্থ কথন (Intradiegetic), এবং

৭. অন্তঃ-অন্তঃস্থ কথন (Metadiegetic) প্রভৃতি। (Genette. 1983. P.227-233) (বিস্তারিত আলোচনা পৃ. ৪৭)

কাহিনির কথন ছাড়াও কাহিনির মধ্যেও কথন থাকতে পারে। স্তর পরম্পরায় থাকা এক বা একাধিক কাহিনির অধস্থ কাহিনিগুলি উর্দ্ধস্থ কথনের অধীনস্থ হয়ে থাকে। এই অনুক্রমিক গঠনের সর্বোচ্চ স্তরটি হল সেটি যে স্তরে কথকের অবস্থান। জেনেটের মতে একদম প্রথম স্তরেই কোনো সাহিত্যকর্ম সম্পাদন সম্পন্ন হলে তাকে বলা হবে বহিঃস্থ কথন। এই স্তরের মধ্যে যে কাহিনির বর্ণনা করা হয় তাহলে যেহেতু সেগুলি প্রথম স্তরের অন্তর্বর্তী সেহেতু এই ঘটনাগুলির কথন হবে অন্তঃস্থ কথন। এই দুটি স্তরের কথনরীতি ছাড়াও জেনেট তৃতীয় আরেকটি স্তরের উল্লেখ করেছেন যাকে তিনি বলেছেন, 'Metadiegetic Narrating', যাকে আমরা বলেছি অন্তঃ-অন্তঃস্থ কথন (বিস্তারিত আলোচনা পৃ. ৪৭)।

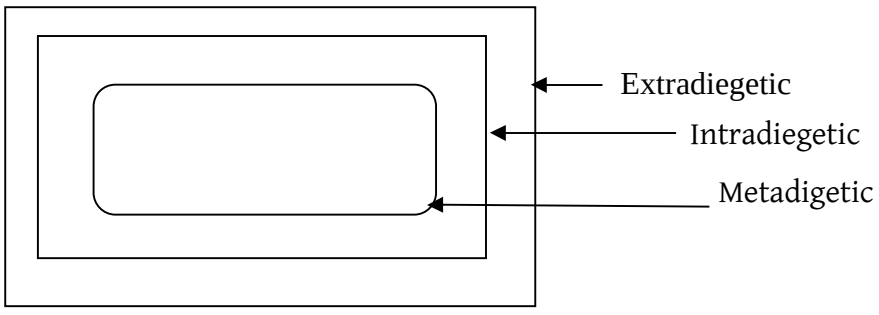

অর্থাৎ, তাঁর মতে প্রথম কথনের ভেতরে দ্বিতীয় স্তরের কথন এবং তারও ভেতরে স্তর পরম্পরায় কাহিনি বিগর্ভিত হয়ে যেতে থাকলে সর্বনিম্নস্তরের কাহিনিটিকে বলা হবে অন্তঃ-অন্তঃস্থ কথন। এই কথনকে কোনো আখ্যানতাত্ত্বিক চীনা বাক্সের সঙ্গে তুলনা করেছেন আবার কেউ কেউ একে ভেবেছেন 'ফ্রেম প্যাটার্ন' হিসেবে। এই ধরনের কথনরীতির ব্যবহার প্রাচীন মহাকাব্যগুলিতে অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়, যেখানে কাহিনির সিংহভাগ অংশ বর্ণনা করতো এক বা একাধিক কথক যারা আবার সেই মহাকাব্যের চরিত্রও বটে।

আখ্যানতাত্ত্বিক রিমন-কেনান জেনেটের উক্ত আলোচনাকে মান্যতা দিয়ে একইভাবে নিজের গ্রন্থের সপ্তম তথা 'Narration: Levels and Voices' শীর্ষক অধ্যায়ের 'Subordination Relations: Narrative Levels' পরিচ্ছেদে আখ্যানের অধীনতামূলক সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা কথনের নানা শ্রেণিবিভাগ নিয়ে আলোচনা করেছেন (Kenan. 1983. P. 91- 94)।

জেরার্ড জেনেটকৃত কথনরীতির ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির শ্রেণিবিভাগকালে একটি সারণির ব্যবহার করা হল;

উপন্যাসের নাম	**আখ্যান সঞ্চরণের সময় বা Time of Narrating**	**আখ্যানের স্তর বা Narrative Level**
বউ-ঠাকুরানীর হাট	সমকালবর্তী কথন	বহিঃস্থ কথন
রাজর্ষি	সমকালবর্তী কথন	বহিঃস্থ কথন
চোখের বালি	উত্তরকালীন কথন	বহিঃস্থ + অন্তঃস্থ কথন (উপন্যাসে ব্যবহৃত চিঠিপত্রগুলির বক্তা উপন্যাসের চরিত্ররা)
নৌকাডুবি	সমকালবর্তী কথন	বহিঃস্থ + অন্তঃস্থ কথন (কমলাকে বলা রমেশের রূপক-গল্প)

গোরা	সমকালবর্তী কথন	বহিঃস্থ কথন
চতুরঙ্গ	উত্তরকালীন কথন	অন্তঃস্থ কথন
ঘরে-বাইরে	বিমলার কথন- উত্তরকালীন কথন এবং সন্দীপ ও নিখিলেশের কথন-সমকালবর্তী কথন	অন্তঃস্থ কথন
যোগাযোগ	উত্তরকালীন কথন	বহিঃস্থ কথন
শেষের কবিতা	সমকালবর্তী কথন	বহিঃস্থ কথন
দুই বোন	সমকালবর্তী কথন	বহিঃস্থ কথন
মালঞ্চ	সমকালবর্তী কথন	বহিঃস্থ কথন
চার অধ্যায়	সমকালবর্তী কথন	বহিঃস্থ কথন

ইতিপূর্বে সন্দর্ভপত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের ‘সময়-বিন্যাস’ শীর্ষক পরিচ্ছেদে আখ্যানের কাহিনিকাল ও কথনকালের বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে উপরের সারণিতে আখ্যানের সময় (Time of Narrating) ভিত্তিতে রবীন্দ্র-উপন্যাসের কথনরীতিকে বিভাজিত করা হয়েছে। জেনেট আখ্যান বর্ণনার কালের নিরিখে কথনরীতিকে যে চারটি ভাগে বিভক্ত করেছেন তার মধ্যে রবীন্দ্র-উপন্যাসে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়েছে উত্তরকালীন এবং সমকালবর্তী কথনরীতি।

অধিকাংশ উপন্যাসেই একধরনের কথনরীতির ব্যবহার লক্ষিত হলেও এই আলোচনাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকার করে থাকে ‘ঘরে-বাইরে’-র উপন্যাসটি। ইতিপূর্বে তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচনাকালে দেখানো হয়েছে বিমলার আত্মকথাগুলি আখ্যানের সমস্ত

ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে লেখা হয়েছে, ফলে আখ্যানে বর্ণিত ঘটনা এবং তার বয়ানের মধ্যে সময়গত একটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে এবং গড়ে উঠেছে জেনেটের ভাষায় উত্তরকালীন কথন। আবার অন্যদিকে উপন্যাসটির অন্য দুই চরিত্র সন্দীপ এবং নিখিলেশের আত্মকথনগুলি রচিত হয়েছে আখ্যানের ঘটনাকালের সমসময়ে, ফলে গড়ে উঠেছে সমকালবর্তী কথন। একইরকমভাবে 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের কাহিনিকাল এবং কথনকালের মধ্যে সময়গত ব্যবধান থাকার কারণে (বিস্তারিত আলোচনা 'সময় বিন্যাস') এই উপন্যাসটিও হয়ে উঠেছে উত্তরকালীন কথনের ফল।

আবার জেনেটকৃত আখ্যানের স্তর এর ভিত্তিতে উপন্যাসগুলির শ্রেণিবিভাগকালে দেখা গেছে রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ উপন্যাসই কথিত হয়েছে সর্বজ্ঞ কথকের দ্বারা, যার অবস্থান কাহিনি তলের বাইরে, ফলে তার কথনটি বহিঃস্থ কথন বা প্রথমস্তরের কথনের ফল। ইতিপূর্বে কথকের শ্রেণিবিভাগ আলোচনাকালে দেখানো হয়েছিল কথকের অবস্থান আখ্যানতলের বাইরে হলে সেই কথক হবেন বিসম কথনবিশ্বের কথক। কিন্তু কথনরীতির আলোচনাকালে এর ধারণাকে আরও একটু বিশদে বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যাবে একদম প্রথম স্তরেই কোনো সাহিত্যকর্ম সম্পন্ন হলে অর্থাৎ আখ্যানে যে স্তরের বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে সেটিই একমাত্র স্তর হলে তাকে বলা হবে বহিঃস্থ কথন। আখ্যানের কথনের মধ্যে স্তর-বিভাজন তখন ঘটে যখন একটি কাহিনির মধ্যে অন্য এক বা একাধিক কাহিনি বিগর্ভিত হয়ে স্থান পায়।

রবীন্দ্র-উপন্যাসগুলিকে জেনেটকৃত আখ্যানের স্তর অনুযায়ী শ্রেণিবদ্ধ করতে গিয়ে বোঝা যায় রবীন্দ্র-উপন্যাসের সিংহভাগ উপন্যাসই বহিঃস্থ কথন বা প্রথমস্তরেই আবদ্ধ ধরনের। অর্থাৎ, কাহিনিটি যে স্তরে কথিত হচ্ছে সেটি ছাড়া অন্য কোনো স্তর তার মধ্যে বিগর্ভিত অবস্থায় নেই। এমন কোনো কথক নেই যিনি প্রথম কথক দ্বারা কথিত। এই সিদ্ধান্ত রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ উপন্যাসের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হলেও একদম প্রথমপর্বের দুটি উপন্যাস ব্যতীত 'চোখের বালি' থেকে উপন্যাসগুলিকে শুধু একটিমাত্র বর্গের অন্তর্ভুক্ত করে বিচার করা সম্ভব কি না সে বিষয়ে ভাবনার অবকাশ রয়েছে। এর কারণ 'চোখের বালি' উপন্যাসে ব্যবহৃত একাধিক চিঠির ব্যবহার। এই চিঠিগুলির বক্তা হিসেবে

পাওয়া যাচ্ছে উপন্যাসেরই চরিত্রদের, কখনো সে বক্তা বিনোদিনী, কখনো আশালতা কিংবা কখনো মহেন্দ্র। অর্থাৎ, আখ্যানের চরিত্ররা চিঠির মাধ্যমে যে বক্তব্য রাখছে তার ফলে আখ্যানে একটি স্তর বিন্যাস গড়ে উঠেছে। চিঠির এই কথকেরা আবার সর্বজ্ঞ কথকের দ্বারা কথিত। ফলে এইসমস্ত ক্ষেত্রে কথন হয়ে পড়েছে অন্তঃস্থ ধরনের।

এছাড়াও ব্যতিক্রম হিসেবে পাওয়া যায় 'নৌকাডুবি'-র একটিমাত্র অংশকে যেখানে রমেশ কমলাকে একটি চেৎসিঙের রূপক আখ্যানের মাধ্যমে কমলা এবং হেমনলিনীকে নিয়ে গড়ে ওঠা তার ব্যক্তিগত জীবনের দ্বন্দ্বমূলক পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে। এবারে রমেশ যে এই কাহিনি বর্ণনা করছে সেই পুরো বিষয়টি আবার বর্ণিত হচ্ছে সর্বজ্ঞ-কথকের দ্বারা ফলে কিছু সময়ের জন্য হলেও আখ্যান-কথনের দিক থেকে একটা স্তর গড়ে উঠেছে এবং এই স্বল্প সময়ের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে অন্তঃস্থ কথন।

আবার 'শেষের কবিতা'-র আরম্ভটা আত্মকথনরীতিতে রচনার হলেও অচিরেই যে আখ্যানের বর্ণনা সর্বজ্ঞ-কথকের কথনপন্থাকে অনুসরণ করেছে সেই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন অধ্যাপক অমিতাভ দাস তাঁর 'আখ্যানতত্ত্ব' গ্রন্থে। এই প্রসঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় উপন্যাসটির প্রথম পরিচ্ছেদের কথকের একটি মন্তব্যের প্রতি,

> ➢ "...তারই থেকে যে'কটা টুকরো উদ্ধার করতে পারলুম তাই আমরা উপরে সাজিয়ে দিয়েছি।" (ঠাকুর। ১৪২৫। পৃ. ১১১০)

অর্থাৎ, আখ্যানের আরম্ভাংশের 'নবীন লেখক'-এর 'আমি' সত্তা অচিরেই বহুবচনে পরিণত হয় এবং তারপরে এই 'আমি' কথকের প্রকট চিহ্ন সেভাবে উপলব্ধ হয় না। অমিতাভ দাস তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন কথক 'আমি'-র নিজের প্রতি এই বহুবচনের ব্যবহার আসলে কথকের বিনীত রূপের বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু কথকের এই 'বিনীত রূপ' অধিকাংশ ক্ষেত্রে সর্বজ্ঞ-কথকের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আত্মকথনরীতির কথক 'আমি' কার্যত এই বহুবচনের ব্যবহার করে না। ফলে বোঝা যায় কেন 'শেষের কবিতা'-কে জেনেটকৃত আখ্যানের স্তর-বিন্যাস অনুযায়ী শুধুমাত্র অন্তঃস্থ ধরনের কথনরীতির অংশীভূত করা যায় না। অন্তঃস্থ রীতির কথন দিয়ে সূচনা হলেও উপন্যাসের প্রায় প্রথম পরিচ্ছেদ থেকেই এই কথন রূপ বদলে বহিঃস্থ কথনে পরিণত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে কথনরীতির আলোচনাকালে দেখানো হয়েছে অমিতাভ দাস তাঁর ‘আখ্যানতত্ত্ব’ গ্রন্থে কথকের অবস্থান কাহিনিতলের বাইরে হলে সৃষ্টি হয় সর্বজ্ঞকথন রীতির আর কথক কাহিনিতলের মধ্যে অবস্থান করলে এবং আখ্যানের কোনো চরিত্রই কথক হলে হয় আত্মকথনরীতির জন্ম। এই আত্মকথনরীতিকে আবার তিনি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছেন যা প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে (বিস্তারিত আলোচনা, পৃ. ৪৩-৪৪)। উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝেছি রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ উপন্যাস কথিত হয়েছে সর্বজ্ঞকথকের সাহায্যে। কিন্তু উপন্যাসগুলির আলোচনা থেকে বোঝা যায় অমিতাভ দাসের বিভাগ অনুযায়ী আত্মকথনরীতির প্রয়োগের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে।

আখ্যানের চরিত্র কাহিনি বর্ণনা করেছে রবীন্দ্রনাথের দুটি উপন্যাসে ‘চতুরঙ্গ’ ও ‘ঘরে-বাইরে’-তে। এর মধ্যে ‘চতুরঙ্গ’-তে কথক হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে উপন্যাসের একটি মাত্র চরিত্র শ্রীবিলাসকে যে নিজের ডায়ারিতে শচীশ ও দামিনীকে কেন্দ্র করে তার জীবনে গড়ে ওঠা নানান অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছে। আবার এই ডায়ারিধর্মই পুনরাবৃত্ত হয়েছে পরবর্তী উপন্যাস ‘ঘরে-বাইরে’-তে গিয়ে। কিন্তু দুটি উপন্যাসের কথনরীতির মধ্যে পার্থক্য এই যে ‘চতুরঙ্গ’-এ যেখানে শুধুমাত্র শ্রীবিলাসের ডায়ারি পাওয়া গেছিল সেখানে ‘ঘরে-বাইরে’-তে তিনটি চরিত্রই পালা করে নিজেদের আত্মকথা জ্ঞাপন করেছে। ফলে অমিতাভ দাসের বিভাজন অনুযায়ী ‘চতুরঙ্গ’ এককরীতির আত্মকথনের এবং ‘ঘরে-বাইরে’ যৌগিক রীতির আত্মকথনের উদাহরণ হিসেবে নির্দিষ্ট হয়।

আবার ‘চতুরঙ্গ’ সম্পর্কে যে কথাটা ইতিপূর্বে চরিত্র-বিন্যাসের আলোচনাকালেও উল্লেখ করা হয়েছে তা হল আত্মকথনরীতির কথক হয়েও শ্রীবিলাসের সর্বজ্ঞকথকের ন্যায় সর্বত্রগামীতার অধিকার প্রাপ্ত হওয়া। সে উপন্যাসে এমন অনেক পরিস্থিতির বর্ণনা করেছে যেখানে সে নিজে অনুপস্থিত ছিল, এবং শচীশের সঙ্গে আলাপের পূর্বের ঘটনাগুলিও সে সর্বজ্ঞকথকের মতোই বর্ণনা করেছে। ফলে এক্ষেত্রে আত্মকথনরীতির মধ্যে বিগর্ভিত হয়েছে সর্বজ্ঞকথনরীতির বৈশিষ্ট্য এবং গড়ে উঠেছে মিশ্ররীতির আত্মকথন।

কথনরীতির ক্ষেত্রে জেফ্রি লিচের মডেল ও তার প্রয়োগ:— জেরার্ড জেনেট বা রিমন কেনান যেমন কথনরীতির ক্ষেত্রে কয়েকটি স্তরের উল্লেখ করেছেন তেমনই জেফ্রি লিচ একটি মডেলের সাহায্যে কথনরীতির মধ্যে থাকা স্তর বিন্যাসের বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন যা নিম্নে যুক্ত করা হল।

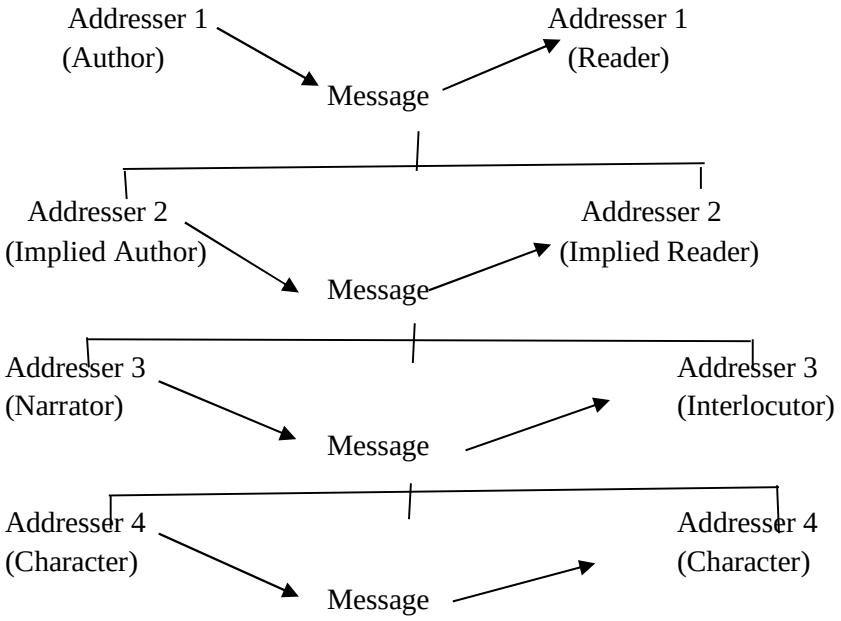

(Leech and Short. 2007p. 216)

লিচ এই মডেলটি সম্পর্কে ব্যাখ্যাকালে বলেছেন,

> "…there is yet another general level of discourse in the novel which we have not yet examined, for embedded within the talk between the narrator and his interlocutor are the conversations which the characters have with one another and which that narrator reports..
> ...the conversations between the characters are ultimately a part of the message from author to reader." (ibid. p. 215-16)

অর্থাৎ, কথক যে কাহিনি বর্ণনা করে তার মধ্যে বিগর্ভিত অবস্থায় থাকে আখ্যানের চরিত্রদের কথোপকথন এবং চরিত্রদের নিজেদের মধ্যে চলতে থাকা এই কথোপকথন আসলে প্রকৃত লেখক থেকে প্রকৃত পাঠকের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে চলা বার্তারই একটি অংশ। চরিত্ররা নিজেদের মধ্যে যে সংলাপে রত থাকে তা একই বার্তা কেন্দ্রিক হতে পারে আবার নাও হতে পারে। বিষয়টি আমরা কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করব আর এক্ষেত্রে আমাদের সহায়ক হবে লিচের মডেলটি।

গোরা:—

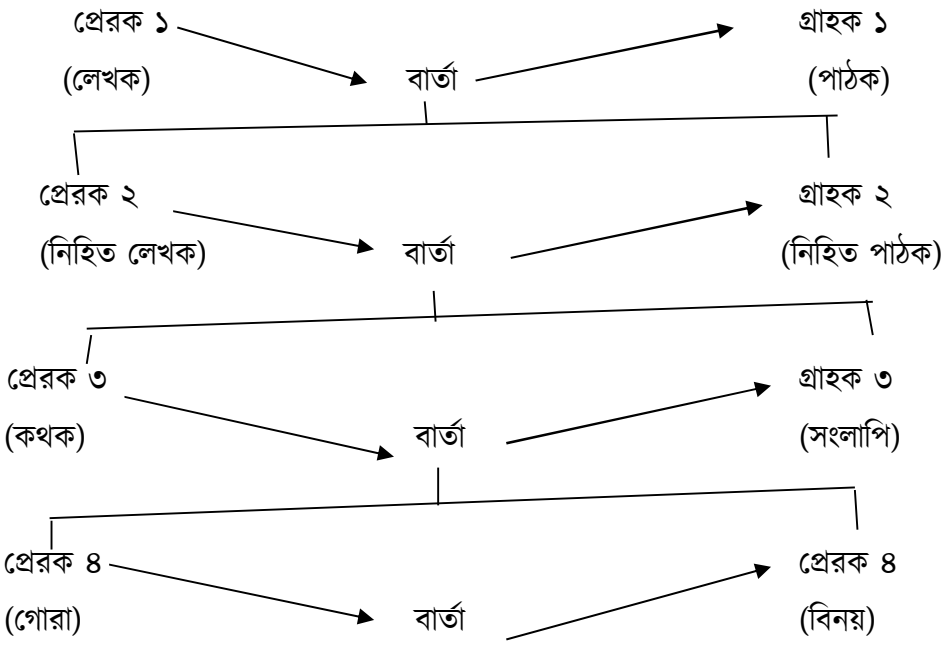

উপরের মডেলটির প্রতি আলোকপাত করলে দেখব গোরা আর বিনয়ের মধ্যে যে কথোপকথন হয় তা ক্রমে স্তর পরম্পরায় পাঠকের কাছে এসে পৌঁছোয়। ধরা যাক তাদের মধ্যে যে নন্দের মৃত্যুর পরে দেশের অন্ধ সংস্কার নিয়ে যে কথোপকথন চলে তা প্রাথমিক পর্যায়ে গোরা থেকে বিনয়ের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। কিন্তু আসলে এই কথোপকথনের বিষয়টির বর্ণনা করে সর্বজ্ঞ কথক তার এক বা একাধিক উহ্য সংলাপি বা গ্রাহকের সঙ্গে। আবার এই কথককে সৃষ্টি করে উপন্যাসটির নিহিত লেখক যে আসলে প্রকৃত লেখক রবীন্দ্রনাথেরই একটি সত্তা। ফলে বার্তাটি ক্রমে ক্রমে নিহিত লেখক থেকে নিহিত পাঠক এবং সর্বশেষে লেখক থেকে পাঠকের মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

আবার এই মডেলটিকেই কিছুটা ভিন্ন সজ্জা দিতে হয় যখন বিনয় ও গোরার মধ্যে সঞ্চারিত বার্তা বিনয়ের মাধ্যমে সুচরিতার কাছে পৌঁছোয়। এক্ষেত্রে মডেলটি হবে নিম্নরূপ,

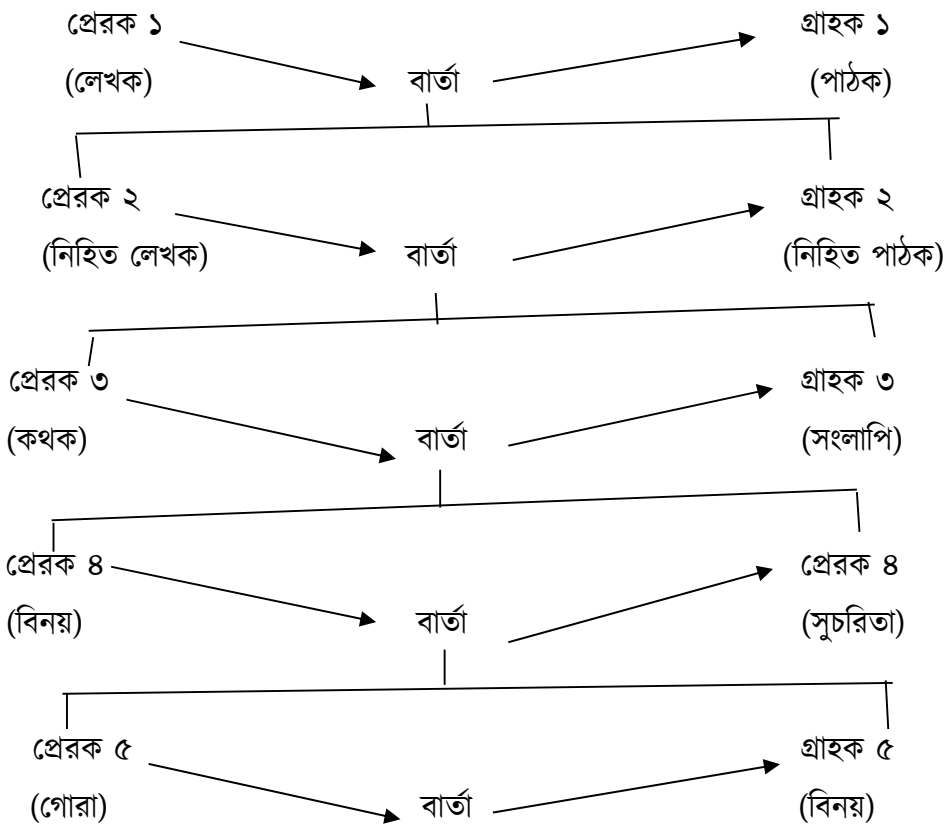

এক্ষেত্রে প্রেরক আর গ্রাহকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। মডেলটির শেষ স্তরের প্রেরক হিসেবে রয়েছে গোরা এবং গ্রাহক হিসেবে রয়েছে বিনয়। এর ব্যাখ্যা করতে গেলে উপন্যাসটির **১৩** সংখ্যক পরিচ্ছেদের প্রতি আলোকপাত করতে হয় যেখানে বিনয় সুচরিতার সঙ্গে কথোপকথনকালে গোরার দেশ এবং হিন্দুত্ববাদ সম্পর্কিত নানান মতামত তুলে ধরেছে। বিনয় যে সুচরিতাকে গোরার অভিমত ব্যক্ত করতে পারছে তার কারণ একসময়ে গোরা আর বিনয়ের মধ্যে একই বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। অর্থাৎ বার্তাটি প্রথম গোরা থেকে বিনয়ে এবং তারপরে বিনয় থেকে সুচরিতায় সঞ্চারিত হয়েছে। এবং এইভাবে স্তর পরম্পরায় কথক, নিহিত লেখক এবং লেখকের থেকে বার্তাটি পাঠকের কাছে এসে পৌঁছেছে।

চতুরঙ্গ:— একইভাবে আমরা উল্লেখ করতে পারি ‘চতুরঙ্গ-এর আখ্যান সঞ্চরণের বিষয়টি সম্পর্কে।

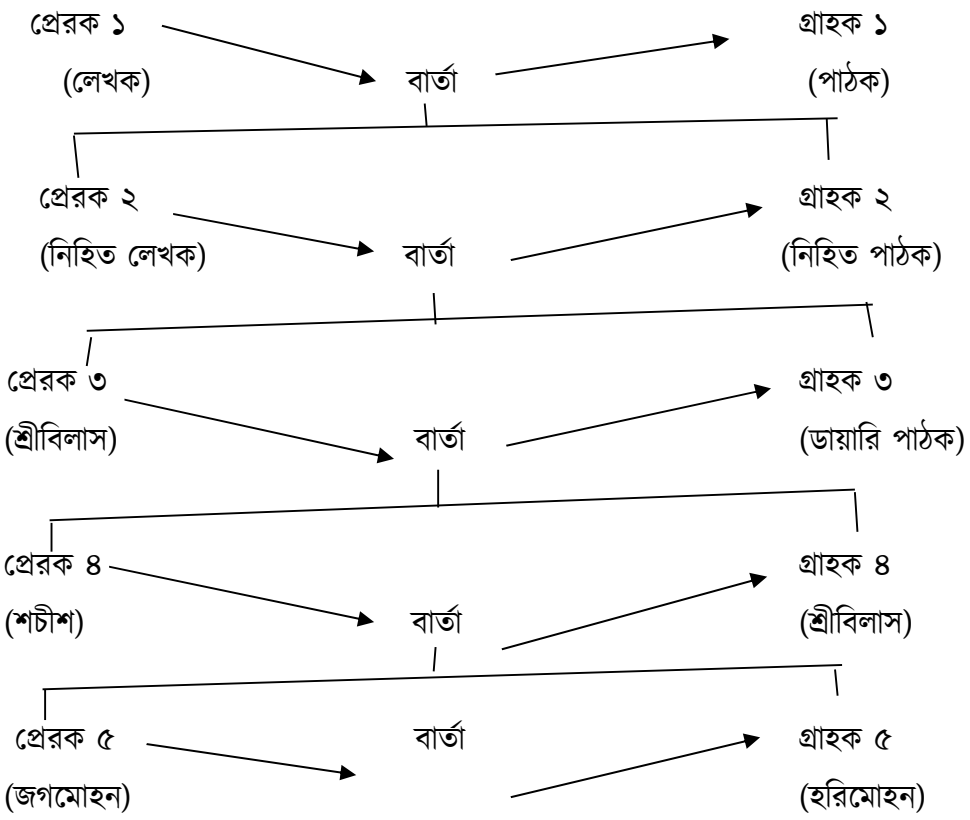

উপন্যাসটির 'জ্যাঠামশায় ৩' শীর্ষক পরিচ্ছেদ থেকে একটি সংলাপের উল্লেখ করে উপরের মডেলটিকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব;

> "ব্রাহ্মরা নিরাকার মানে, তাহাকে চোখে দেখা যায় না। তোমরা সাকারকে মান, তাহাকে কানে শোনা যায় না। আমরা সজীবকে মানি; তাহাকে চোখে দেখা যায়, কানে শোনা যায়, তাহাকে বিশ্বাস না করিয়া থাকা যায় না।" (ঠাকুর। ১৪২৫। পৃ. ৮০৩)

এই যে বার্তাটি এ আসলে জগমোহন এবং হরিমোহনের মধ্যে কথোপকথনের একটি অংশ যেখানে প্রেরক জগমোহন এবং গ্রাহক হরিমোহন। আবার উপন্যাস পাঠে এবং এই সময়কালের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় শচীশের সঙ্গে শ্রীবিলাসের এইসময় পরিচয় হয়নি। কাজেই জগমোহন এবং হরিমোহনের মধ্যে চলা এই কথোপকথন শ্রীবিলাস পরে জেনেছে হয় শচীশের মুখ থেকে নয়তো শচীশের ডায়ারি থেকে যা সে আবার বর্ণনা করেছে নিজের ডায়ারিতে, ফলে একাধিক প্রেরক এবং গ্রাহকের স্তরের সৃষ্টি হয়েছে। এবং এই একাধিক প্রেরক এবং গ্রাহকের স্তর অতিক্রম করে বার্তাটি পাঠকের প্রতি সঞ্চারিত হয়েছে।

রবীন্দ্র-উপন্যাসের কথনরীতি সম্পর্কিত আলোচনার উপান্তে এসে অনুভব করা যায় এ আলোচনা শুধুমাত্র কথকের শ্রেণি-বিভাজন আর কথনরীতির আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ

থাকতে পারে না। এই আলোচনায় অবশ্যম্ভাবী রূপে যুক্ত হয়ে যায় নিহিত লেখক এবং প্রকৃত লেখকের স্বর। বিষয়টি কতকগুলি উদাহরণ ও তাদের বিশ্লেষণের মাধ্যমে বুঝে নেওয়া যেতে পারে। যেমন,

> **১. চোখের বালি:—** "সংসারের কঠিন কর্তব্য হইতে প্রেমকে ফুলের মতো ছিঁড়িয়া স্বতন্ত্র করিয়া লইলে, তাহা কেবল আপনার রসে আপনাকে সজীব রাখিতে পারে না, তাহা ক্রমেই বিমর্ষ ও বিকৃত হইয়া আসে।" (ঠাকুর। ১৪২৫। পৃ. ২০৫)

এই একইধরনের মন্তব্য খুঁজে পাওয়া যায় 'চোখের বালি'-র প্রায় সমকালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা'-তে, যা পরবর্তীকালে 'প্রাচীন সাহিত্য' প্রবন্ধ-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ উক্ত দুই প্রাচীন সাহিত্যকর্মের বিশ্লেষণকালে যা বলেছেন তা বাহ্যত 'চোখের বালি'-র মন্তব্যের সঙ্গে একীভূত না হলেও এই দুই মন্তব্যের অন্তর্লীন অর্থ একই। পূর্বোক্ত প্রবন্ধটি থেকে একটি ক্ষুদ্র অনুচ্ছেদ উল্লেখ করে বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়া যায়;

> "যে প্রেমের কোনো বন্ধন নাই, কোনো নিয়ম নাই, যাহা অকস্মাৎ নরনারীকে অভিভূত করিয়া সংযমদুর্গের ভগ্নপ্রাকারের উপর আপনার জয়ধ্বজা নিখাত করে, কালিদাস তাহার শক্তি স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করেন নাই। তিনি দেখাইয়াছেন, যে অন্ধ প্রেমসম্ভোগ আমাদিগকে স্বাধিকারপ্রমত্ত করে তাহা ভর্তৃশাপের দ্বারা খণ্ডিত, ঋষিশাপের দ্বারা প্রতিহত ও দেবরোষের দ্বারা ভস্মসাৎ হইয়া থাকে। শকুন্তলার কাছে যখন আতিথ্যধর্ম কিছুই নহে, দুষ্মন্তই সমস্ত, তখন শকুন্তলার সে প্রেমে আর কল্যাণ রহিল না। যে উন্মত্ত প্রেম প্রিয়জনকে ছাড়া আর-সমস্তই বিশ্মৃত হয় তাহা সমস্ত বিশ্বনীতিকে আপনার প্রতিকূল করিয়া তোলে, সেইজন্যই সে প্রেম অল্প দিনের মধ্যেই দুর্ভর হইয়া উঠে, সকলের বিরুদ্ধে আপনাকে আপনি সে আর বহন করিয়া উঠিতে পারে না।" (ঠাকুর। ১৪১৭। পৃ. ৭১৯)

'চোখের বালি' এবং 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা'-র থেকে উদ্ধৃত উক্ত দুই অনুচ্ছেদের সমান্তরাল পাঠে বোঝা যায় এই দুই অংশের রচনার পিছনে প্রকৃত লেখকের ব্যক্তিগত বিশ্বাস-অবিশ্বাস কাজ করে গেছে। যুগপৎ নিহিত লেখক এবং কথকের বয়ানের মধ্যে সোচ্চার হয়ে উঠেছে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস। একইরকমভাবে উল্লেখ করা যায় 'গোরা'- উপন্যাসের ১১নং পরিচ্ছেদ থেকে গৃহিত নিম্নের অংশটিকে,

> "সাধারণত আমাদের দেশের লোকেরা স্বজাতি ও স্বদেশের আলোচনায় কিছু-না-কিছু মুরুব্বিয়ানা ফলাইয়া থাকে; তাহাকে গভীর ভাবে সত্য ভাবে বিশ্বাস করে না; এইজন্য মুখে কবিত্ব করিবার বেলায় দেশের সম্বন্ধে যাহাই বলুক দেশের প্রতি তাহাদের ভরসা নাই; ...।" (ঠাকুর। ১৪২৫। পৃ. ৫৪২)

উক্ত অংশের বক্তা সর্বজ্ঞ-কথক হলেও এই কথক নিজের প্রতি বহুবচনের ব্যবহারে যে শুধুমাত্র 'বিনীতরূপের' (দাস। ২০১৪। পৃ.৮১) প্রকাশ ঘটিয়েছে তাই নয়, কথক এক্ষেত্রে স্বদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কিত আলোচনাকালে পাঠককেও নিজের সঙ্গে এক করার মানসিকতা পোষণ করেছে। এবং এই বক্তব্যকে শুধুমাত্র সর্বজ্ঞ-কথকের মন্তব্য হিসেবে চিহ্নিত করতে দোলাচলতার সৃষ্টি হয় যখন 'কালান্তর'-প্রবন্ধ গ্রন্থের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-সমাজ সম্পর্কিত একাধিক প্রবন্ধে এই একই জাতীয় বক্তব্য দৃষ্টিগোচর হয়। উপন্যাস 'গোরা'-র থেকে উদ্ধৃত অংশের বক্তব্যের মধ্যে প্রকৃত লেখক সত্তার অনুভব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এই প্রসঙ্গটিকেই আরও একটু সুস্পষ্ট করার পরিকল্পনায় আরও দুটি উদাহরণের সাহায্য নিতে হয়। এর প্রথমটি রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের উপন্যাস 'দুই বোন' এবং দ্বিতীয়টি 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের ২৩ সংখ্যক কবিতার অংশবিশেষ।

> ক. "মেয়েরা দুই জাতের, কোনো কোনো পণ্ডিতের কাছে এমন কথা শুনেছি।
> এক জাত প্রধানত মা, আর-এক জাত প্রিয়া।
> ঋতুর সঙ্গে তুলনা করা যায় যদি, মা হলেন বর্ষাঋতু। জলদান করেন, ফলদান করেন, নিবারণ করেন তাপ, ঊর্ধ্বলোক থেকে আপনাকে দেন বিগলিত করে, দূর করেন শুষ্কতা, ভরিয়ে দেন অভাব।
> আর প্রিয়া বসন্তঋতু। গভীর তার রহস্য, মধুর তার মায়ামন্ত্র, তার চাঞ্চল্য রক্তে তোলে তরঙ্গ, পৌঁছয় চিত্তের সেই মণিকোঠায়, যেখানে সোনার বীণায় একটি নিভৃত তার রয়েছে নীরবে,..." (ঠাকুর। ১৪২৫। পৃ.১১৭৭)

খ. "কোন ক্ষণে
সৃজনের সমুদ্রমন্থনে
উঠেছিল দুই নারী।
অতলের শয্যাতল ছাড়ি।
একজনা উর্বশী, সুন্দরী,
বিশ্বের কামনা-রাজ্যে রানী,
স্বর্গের অপ্সরী।
অন্যজনা লক্ষ্মী, সে কল্যাণী,
বিশ্বের জননী তাঁরে জানি,
স্বর্গের ঈশ্বরী।"
(ঠাকুর। ১৪১৭। পৃ. ২৭৪)

উদ্ধৃত দুটি উক্তিকে সমান্তরালভাবে পাঠ করলে বোঝা যায় রবীন্দ্র-চেতনায় নারী ও ঋতু কীভাবে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে একাধিক সাহিত্য সংরূপে স্থান পেয়েছে। একই ভাবনা ভিন্ন

ভিন্ন সময়ে রচিত ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্যকর্মে স্থান পাওয়ার পেছনে থাকে প্রকৃত লেখকের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের গভীর কর্তৃত্ব। আর এই বিন্দু থেকেই কথকের সঙ্গে নিহিত লেখক, প্রকৃত লেখক এবং সর্বোপরি ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথের স্বরের ধ্বনির স্পষ্টতা জনিত নানান সমালোচনা উঠে আসে।

রবীন্দ্ররচনা পঞ্জির সমান্তরালে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত চিঠিপত্রগুলির প্রতি আলোকপাত করলেও বোঝা যাবে তাঁর প্রকৃত লেখক সত্তা যখন যে রচনাকর্মে নিয়োজিত থেকেছে তার পেছনে কাজ করেছে বিশেষ একধরনের মানসিক স্থিতি; ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ সেই বিশেষ ধারণাতে বিশ্বাস করেছেন বলেই কাছাকাছি সময়ে রচিত একাধিক সাহিত্যকর্মে একই জাতীয় ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মগুলিতে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের স্বর প্রকট হয়ে উঠে প্রতিধ্বনিত হয়েছে হয় কথকের স্বরে অথবা আখ্যানের কোনো চরিত্রের কথকতায়। এই বিষয়টি রবীন্দ্র-উপন্যাসগুলির ক্ষেত্রে আরও বেশি স্পষ্ট রূপে প্রতিভাত। উপন্যাসগুলিতে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের স্বরের এই কর্তৃত্বের ফলেই একাধিক সমালোচক রবীন্দ্র-উপন্যাসের চরিত্রদের পুতুল ধর্মীতা নিয়ে একাধিক সমালোচনাকর্ম সম্পাদন করেছেন। পুতুল-ধর্মীতা, অর্থাৎ কথক এবং লেখকের দ্বারা একান্তভাবে চালিত চরিত্রবর্গ। ‘বউ-ঠাকুরানীর হাট’, ‘রাজর্ষি’, ‘নৌকাডুবি’, ‘যোগাযোগ’, ‘শেষের কবিতা’, ‘দুই বোন’ এবং ‘চার অধ্যায়’— অর্থাৎ প্রায় সিংহভাগ উপন্যাসের থেকেই ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের স্বর, প্রকৃত লেখক এবং নিহিত লেখকের পক্ষপাতের ক্ষেত্রগুলি উপন্যাস বিশেষে কথক এবং চরিত্রদের বয়ানের মধ্যে দিয়ে প্রস্ফুটিত হয়েছে।

ব্যতিক্রম হিসেবে যে কয়েকটি উপন্যাস পাওয়া যায় তার মধ্যে থেকেও ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের মতগুলিকে চিহ্নিত করা অসম্ভব হয় না। যেমন, ‘চোখের বালি’-তে বিহারী, ‘গোরা’-তে মুখ্যত আনন্দময়ী, পরেশবাবু এবং স্থান বিশেষে গোরা, ‘চতুরঙ্গ’-তে জ্যাঠামশাই এবং স্থান বিশেষে শচীশ, ‘ঘরে-বাইরে’-তে নিখিলেশ যে লেখকের করুণা এবং পক্ষপাতদুষ্ট এবং আখ্যানের এই চরিত্রগুলির মধ্যে দিয়েই যে লেখক রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যক্তিগত চিন্তা-বিশ্বাস-ধারণার প্রকাশ ঘটিয়েছেন তা অতি সহজেই অনুধাবন করা যায়। ‘চোখের বালি’ উপন্যাসে বিহারী কিংবা অন্নপূর্ণার বাচনের মধ্যে দিয়ে যুগপৎ কথক

এবং প্রকৃত লেখকের স্বর অনুধাবন করা গেলেও রাজলক্ষ্মী, বিনোদিনী, মহেন্দ্র কিংবা বিনোদিনীর গ্রামের মেয়ে-বৌদের ভিন্নস্বরের কথন একদিকে যেমন সমাজের একটা অংশের ভাবনাকে প্রকাশ করেছে তেমনই সমাজ নির্ধারিত নিয়ম-নীতিকে অগ্রাহ্য করার মতো স্বরের দার্ঢ্য চোখে পড়েছে এই চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে।

কাজেই আলোচনা শেষে বোঝা যায় কেন রবীন্দ্র-উপন্যাসের কথনরীতির আলোচনাকে শুধুমাত্র কতকগুলি তাত্ত্বিক শ্রেণিবিভাজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা যায় না, তা নিহিত লেখক, প্রকৃত লেখকের গণ্ডিকে অতিক্রম করে অতি সহজেই ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের মনন-লোককে স্পর্শ করে ফেলে।

(খ) দৃষ্টিকোণ

আখ্যানের কাহিনি উপস্থাপনা কথকের যে যে অবস্থান থেকে হতে পারে তার ওপর নির্ভর করে নির্ধারিত হয় কথন পরিস্থিতি। এই বিষয়টিকে অমিতাভ দাস তাঁর 'আখ্যানতত্ত্ব' গ্রন্থে একটি সারণির সাহায্যে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন যা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

নিরীক্ষণ ⟶	নিরীক্ষক ⟶	কথক	কাহিনীতলে অবস্থিতি	পরিণাম
		+	+	আত্মকথন: অন্তঃপ্রেক্ষিত
		+	-	সর্বজ্ঞকথন: বহি:প্রেক্ষিত
		±	∓	ভূমিকানুগ কথন : অন্তঃ – বহিঃপ্রেক্ষিত

(দাস। ২০১৪। পৃ. ৭৬)

সন্দর্ভপত্রের প্রথম অধ্যায়ের আলোচনা থেকে জানা গিয়েছে (বিস্তারিত আলোচনা পৃ. ৪৭-৫৪) আখ্যানতাত্ত্বিকেরা নিরীক্ষকের অবস্থানভেদে নিরীক্ষণের দুই ভাগ তথা বহিঃস্থ এবং অন্তঃস্থ নিরীক্ষণ এবং নিরীক্ষণের প্রকৃতিভেদে আক্ষরিক নিরীক্ষণ, লাক্ষণিক বা ধারণামূলক নিরীক্ষণ এবং স্থানান্তরিত বা ব্যক্তিগত প্রভাব নির্ভর নিরীক্ষণ এই তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রথম অধ্যায়ের আলোচনাকালেই নিরীক্ষণের এই বিভিন্ন ভাগগুলি সম্পর্কে যথাসম্ভব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ফলে আলোচনার এই পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করে নিরীক্ষণের নানান রকমফের সম্পর্কে আলোচনা ও বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হবে।

১. বউ-ঠাকুরানীর হাট:— "তখন ক্ষীণ চন্দ্র অস্ত যায়। চারি দিকে অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। কোথাও সাড়াশব্দ নাই। রামচন্দ্র রায় তাঁহার শয়নকক্ষের দ্বারে দাঁড়াইয়া দেখিলেন দুই পার্শ্বে রাজ-অন্তঃপুরে শ্রেণীবদ্ধ কক্ষে দ্বার রুদ্ধ, সকলেই নিঃশঙ্কচিত্তে ঘুমাইতেছে। সম্মুখের প্রাঙ্গনে চারিদিকের ভিত্তির ছায়া পড়িয়াছে ও তাহার এক পার্শ্বে একটুখানি জ্যোৎস্না এখনো অবশিষ্ট রহিয়াছে। ... রামচন্দ্র রায় কল্পনা করিতে লাগিলেন,

এই চারি দিকের অন্ধকারের মধ্যে না জানি কোথায় একটা ছুরি তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। দক্ষিণে না বামে, সম্মুখে না পশ্চাতে?" (ঠাকুর। ১৪২৫। পৃ.৩৫) (নিরীক্ষক রামচন্দ্র রায়। অন্তঃপ্রেক্ষিত। ধারণামূলক নিরীক্ষণ)

সর্বজ্ঞ-কথকের বয়ানে পরিবেশিত উপন্যাস 'বউ-ঠাকুরানীর হাট'-এ মোটের ওপর প্রাধান্য পেয়েছে সর্বজ্ঞ-কথকের নিরীক্ষণ, যার অবস্থান কাহিনি-তলের বাইরে অর্থাৎ তার নিরীক্ষণ বহিঃস্থ ধরনের। যদিও সমগ্র উপন্যাসে টুকরো টুকরো অনেক ঘটনা ঘটেছে যেগুলির নিরীক্ষক হিসেবে পাওয়া যায় উপন্যাসেরই কিছু চরিত্রকে। যেমন, আলোচ্য উপন্যাসটি থেকে উদ্ধৃত উক্ত অংশের নিরীক্ষক উপন্যাসের একটি চরিত্র রামচন্দ্র রায়। অর্থাৎ, তার দ্বারা এই নিরীক্ষণ ঘটেছে কাহিনিতলের অবস্থান থেকে। ফলে এক্ষেত্রে গড়ে উঠেছে অন্তঃস্থ নিরীক্ষণ। পাশাপাশি নিরীক্ষকের এই নিরীক্ষণের সঙ্গে মিশে গেছে তার ব্যক্তিগত অরক্ষিত এবং নিরাপত্তাহীনতাবোধ; সে ক্রমাগত কল্পনা করে চলেছে কোনো এক গুপ্ত-ঘাতককে। সেই কল্পনা এবং তার থেকে সৃষ্ট হওয়া ভয় এবং অবিশ্বাস তার নিরীক্ষণের সঙ্গে মিশে গেছে; ফলে এটি অন্তঃস্থ নিরীক্ষণের হওয়ার পাশাপাশি হয়ে উঠেছে ধারণামূলক নিরীক্ষণ।

আবার রিমন-কেনানের নিরীক্ষণের নানা অভিমুখের বিশ্লেষণ অনুযায়ী (বিস্তারিত আলোচনা পৃ. ৫২-৫৪) দেখতে গেলে দেখব, রামচন্দ্র রায় যে মুহূর্তে গুপ্ত ঘাতকের হাতে তার মৃত্যু সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনেছে সেই মুহূর্তে তার মধ্যে গড়ে ওঠা নানান অনুভূতি মিশে গেছে তার নিরীক্ষণ বিন্দুর মধ্যে। ফলে এই নিরীক্ষণের সঙ্গে নিরীক্ষক রামচন্দ্র রায়ের আবেগ-কেন্দ্রিক দিকটির যোগ রয়েছে।

২. রাজর্ষি:— ক. "মন্দিরের কাজকর্ম শেষ করিয়া জয়সিংহ তাঁহার কুটিরের দ্বারে বসিয়া আছেন। সম্মুখে মন্দিরের কানন। বিকাল হইয়া আসিতেছে। অত্যন্ত ঘন মেঘ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। নববর্ষার জলে জয়সিংহের গাছগুলি স্নান করিতেছে, বৃষ্টিবিন্দুর নৃত্যে পাতায় পাতায় উৎসব পড়িয়া গিয়াছে, বর্ষাজলের ছোটো ছোটো শত শত প্রবাহ ঘোলা হইয়া, কলকল করিয়া গোমতী নদীতে গিয়া পড়িতেছে—..." (পৃ. ১০৮) (নিরীক্ষক: সর্বজ্ঞ কথক। বহিঃস্থ নিরীক্ষণ। আক্ষরিক বা প্রত্যক্ষজ নিরীক্ষণ)

পূর্ববর্তী উপন্যাসের মতোই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত এই দ্বিতীয় উপন্যাসেও প্রাধান্য পেয়েছে সর্বজ্ঞ-কথকের বহিঃস্থ নিরীক্ষণ। সর্বজ্ঞ-কথন রীতিতে কথিত উপন্যাস 'রাজর্ষি'-র থেকে

উদ্ধৃত উপরোক্ত অনুচ্ছেদের নিরীক্ষক সর্বজ্ঞ-কথক। কথক কাহিনিতলের বাইরে থেকে জয়সিংহ এবং বর্ষণমুখরিত দিনটির নিরীক্ষণ এবং বর্ণনা করছেন, ফলে গড়ে উঠেছে বহিঃস্থ নিরীক্ষণ। পাশাপাশি এই নিরীক্ষণ এবং বর্ণনার মধ্যে নিরীক্ষকের কোনো মানসিক যোগ নেই, তিনি যা নিরীক্ষণ করেছেন তাই বর্ণনা করেছেন; ফলে এটি আক্ষরিক নিরীক্ষণের উদাহরণ হিসেবে প্রতীয়মান।

আবার রিমন-কেনানকে অনুসরণ করে বলা যায় উক্ত অংশের নিরীক্ষক সর্বজ্ঞকথক, যার অবস্থান কাহিনি তলের অনেক উপরে, ফলে তার দৃষ্টি বিস্তৃত। সে একদিকে যেমন জয়সিংহকে নিরীক্ষণ করে তেমনই অপরদিকে একই সময়ে নিরীক্ষণ করতে পারে রঘুপতিকেও। ফলে এক্ষেত্রে নিরীক্ষণের সঙ্গে উপলব্ধিগত দিকটির (বিস্তারিত আলোচনা পৃ. ৫২-৫৪) স্থানবাচক সম্পর্কের যোগ খুঁজে পাওয়া যায়। একইভাবে এই নিরীক্ষক কাহিনিতলের বাইরে অবস্থান করার ফলে তার এই নিরীক্ষণ হয় নিরপেক্ষ, যাকে রিমন-কেনান আবেগ-কেন্দ্রিক উপাদানের অন্তর্গত করেছেন।

> **খ.** "গোবিন্দমাণিক্য চাহিয়া দেখিলেন, ফকিরকে ফকির বলিয়া বোধ হইল না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থপর বাসনা হইতে হৃদয়কে প্রত্যাহরণ করিয়া একমাত্র বৃহৎ উদ্দেশ্যের মধ্যে স্থাপন করিলে মুখে যে একপ্রকার জ্বালাবিহীন বিমল জ্যোতি প্রকাশ পায়, ফকিরের মুখে তাহা দেখিতে পাইলেন না। ফকির সর্বদা-সতর্ক সচকিত। তাঁহার হৃদয়ের তৃষিত বাসনা সকল তাঁহার দুই জ্বলন্ত নেত্র হইতে যেন অগ্নি পান করিতেছে।" (পৃ. ১৭৯) (নিরীক্ষক: গোবিন্দমাণিক্য। অন্তঃস্থ নিরীক্ষণ। লাক্ষণিক বা ধারণামূলক নিরীক্ষণ)

আবার একই উপন্যাস থেকে উদ্ধৃত উক্ত অংশের নিরীক্ষক হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে উপন্যাসের চরিত্র গোবিন্দমাণিক্যকে। অর্থাৎ, নিরীক্ষণকর্তার অবস্থান কাহিনি-তলে। ফলে গড়ে উঠেছে অন্তঃপ্রেক্ষিত। এরই পাশাপাশি নিরীক্ষণকর্তার দৃষ্টির মধ্যে মিশে গেছে তাঁর ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা। ফকিরকে যে তার ফকির বলে বোধ হল না, তার কারণ গোবিন্দমাণিক্য নিজে ইতিমধ্যে সন্ন্যাস-জীবন যাপন করে ফেলেছে, হৃদয়ের অন্তঃস্থলে রক্ষিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামনা-বাসনাকে কীভাবে উৎপাটিত করলে বিরাজ করে নির্ভার উজ্জ্বল আনন্দ তা গোবিন্দমাণিক্য চরিত্রটি ইতিমধ্যে জেনেছে। ফলে সেই নিজস্ব উপলব্ধিজাত ধারণার সঙ্গে ফকিরের আচরণের মিল খুঁজে পায়নি বলেই তার আগন্তুক ফকিরকে ফকির বলে মনে হয়নি। এই যে নিরীক্ষক গোবিন্দমাণিক্যের দৃষ্টিকোণের সঙ্গে মিশে গেছে তার

ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা তার ফলেই তার এই নিরীক্ষণ হয়ে উঠেছে লাক্ষণিক বা ধারণামূলক।

এই অংশটিকেই রিমন-কেনানের নিরীক্ষণের নানা দিকের নিরিখে বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যাবে, উক্ত অংশের নিরীক্ষক উপন্যাসের চরিত্র যার কাহিনিতলে অবস্থিতির ফলে গড়ে উঠেছে অন্তঃস্থ নিরীক্ষণ। এই অন্তঃস্থ নিরীক্ষক হওয়ার কারণেই তার দৃষ্টি সীমিত। সে শুধুমাত্র তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ফকির আর তার সঙ্গে থাকা তিনটি বালক ছাড়া একই সময়ে অন্য কিছু দেখতে পারছে না। নিরীক্ষণ বিন্দুর এই সীমাবদ্ধতাকেও রিমন-কেনান উপলব্ধিগত দিকের অন্তর্ভুক্ত করেন। আবার নিরীক্ষক অন্তঃস্থ হওয়ার কারণে তার নিরীক্ষণ নিরপেক্ষ হয় না, এক্ষেত্রেও তা হয়নি। গোবিন্দমাণিক্য ফকিরকে শুধু নিরীক্ষণ করছে না তাকে মূল্যায়নও করছে, এবং এই মূল্যায়ন সে করছে তার ব্যক্তিগত উপলব্ধি এবং আবেগ থেকে। ফলে গোবিন্দমাণিক্যের এই নিরীক্ষণকে আমরা রিমন কেনানের ভাষায় নিরীক্ষণের আবেগগত দিক হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি।

> **৩. চোখের বালি:— ক.** "বিনোদিনী এই অস্থানে পতিত কলিকাতার ছেলেটির নির্বাসনদণ্ডও যথাসাধ্য লঘু করিবার জন্য অন্তঃপুরের অন্তরাল হইতে চেষ্টা করিত। বিহারী প্রত্যেক বার পাড়া পর্যটন করিয়া আসিয়া দেখিত, কে তাহার ঘরটিকে প্রত্যেক বার পরিপাটি পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, একটি কাঁসার গ্লাসে দু-চারটি ফুল এবং পাতার তোড়া সাজাইয়াছে এবং তাহার গদির এক ধারে বঙ্কিম ও দীনবন্ধুর গ্রন্থাবলী গুছাইয়া রাখিয়াছে। গ্রন্থের ভিতরের মলাটে মেয়েলি অথচ পাকা অক্ষরে বিনোদিনীর নাম লেখা।" (পৃ. ২০৩) (নিরীক্ষক: সর্বজ্ঞ-কথক। বহিঃস্থ নিরীক্ষণ। লাক্ষণিক বা ধারণামূলক নিরীক্ষণ)

সর্বজ্ঞ-কথনরীতিতে কথিত উপন্যাস 'চোখের বালি' থেকে উদ্ধৃত অংশের নিরীক্ষক সর্বজ্ঞ-কথক; যার অবস্থান আখ্যানতলের বাইরে। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে গড়ে উঠেছে বহিঃস্থ নিরীক্ষণ। সর্বজ্ঞ-কথকের নিরীক্ষণের মধ্যে একধরনের বিবিক্ততার বোধ অনুভূত হলেও কথক তার এই নিরীক্ষণের মধ্যে দিয়ে আসলে আমাদের বিনোদিনীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রয়াস করেছে। বিনোদিনী যে কর্মঠ, রুচিশীল, শিক্ষিতা সেসমস্ত তথ্য পাঠক পাচ্ছে কথকের এই নিরীক্ষণের মধ্য দিয়ে।

এই অংশটিকেই রিমন-কেনানের নিরীক্ষণের ধারণার নিক্তিতে বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখব উক্ত অংশের নিরীক্ষকের অবস্থান কাহিনিতলের অনেক উর্দ্ধে বলেই বিহঙ্গ-দৃষ্টি নিয়ে সে যেমন একদিকে বিহারীর পাড়ার সর্দার হয়ে ওঠার কার্য-পরম্পরা লক্ষ করে তেমনই অন্যদিকে একই সময়ে বিহারীর ঘরের ভেতরের সজ্জা-প্রণালী যা বিনোদিনীর দ্বারা বারেবারে বদল হয়েছে, তা-ও নিরীক্ষণ করার ক্ষমতা রাখে। ফলে বহিঃস্থ নিরীক্ষকের একই সময়ে একাধিক স্থানের নিরীক্ষণ করার এই ক্ষমতা রিমন কেনানের নিক্তি অনুযায়ী উপলব্ধিগত অভিমুখের অন্তর্ভুক্ত হয়। আবার এই সর্বজ্ঞকথকের দৃষ্টিকোণই আখ্যানের কেন্দ্রীয় নিরীক্ষণ বা ধ্রুবক। কিন্তু বহিঃস্থ নিরীক্ষক হওয়ার পরেও উক্ত অংশের নিরীক্ষণ নিরপেক্ষ নয়; নিরীক্ষকের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য যুক্ত হয়ে গেছে, কথক-নিরীক্ষক আসলে বিনোদিনীর চরিত্রের একটা ইতিবাচক দিকের প্রতি আলোকপাতের চেষ্টা করেছে। কারণ উপন্যাসের গভীর পাঠে উপলব্ধি করতে পারা যায় যে শেষ পর্যন্ত বিনোদিনীকে নেতিবাচক চরিত্র হিসেবে প্রতিপন্ন করতে চাওয়া হয়নি। ফলে এই নিরীক্ষণের সঙ্গে আসলে নিরীক্ষকের আদর্শগত দিকটির সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে।

> **খ.**"তৃষিত বক্ষে এই শান্তির আশা বহন করিয়া বিনোদিনী আপনার কুটিরের মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু হায়, শান্তি কোথায়। কেবল শূন্যতা এবং দারিদ্র্য। চারি দিকেই সমস্ত জীর্ণ অপরিচ্ছন্ন, অনাদৃত, মলিন।" (পৃ. ২৮১) (নিরীক্ষক: বিনোদিনী। অন্তঃস্থ নিরীক্ষণ। ব্যক্তিগত প্রভাব নির্ভর নিরীক্ষণ)

রবীন্দ্র-উপন্যাসের ক্রমধারার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করলে বোঝা যায় একদম শুরুর দুটি উপন্যাসের পরে উপন্যাস-রচনা ক্ষেত্রে একটি দীর্ঘ সময়ের বিরতি নিয়ে রচিত হয়েছিল উপন্যাস 'চোখের বালি', যার প্রধান লক্ষ্য ছিল চরিত্রদের 'আঁতের কথা' বিশ্লেষণ করা। ফলে এই কাজটি সম্যকরূপে ফুটিয়ে তোলার জন্য প্রয়োজন ছিল কিছু বিষয় বা ঘটনাকে চরিত্রদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখানো। ফলে সর্বজ্ঞ-কথনরীতিতে কথিত হলেও উপন্যাস 'চোখের বালি'-তে একাধিক ঘটনা বা বিষয় বা পরিস্থিতিকে চরিত্রদের দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখানো হয়েছে। যেমন, উপরোক্ত অনুচ্ছেদের নিরীক্ষক উপন্যাসটির অন্যতম প্রধান চরিত্র বিনোদিনী; যার অবস্থান আখ্যানতলে। আখ্যানতলে নিরীক্ষকের অবস্থিতির ফলে গড়ে উঠেছে অন্তঃস্থ নিরীক্ষণ। আবার দীর্ঘ সময় শহর-কলকাতায় বাস, সেখানকার

আধুনিক আদব-কায়দায় অভ্যস্থ হয়ে যাওয়া নিরীক্ষক বিনোদিনীর বিলাসি মন যতই নানান জটিলতাকে এড়িয়ে যেতে গ্রামের পুরাতন গৃহ-ছায়ায় মুখ লুকোতে চায় তার স্বভাব তত সহজে জীর্ণ মাটির কুটির, ততধিক জীর্ণ গ্রাম্য-সমাজকে মেনে নিতে পারে না। ফলে আবাল্য গ্রামীণ পরিবেশেই বেড়ে ওঠা বিনোদিনীর কিছু মাস কোলকাতা বাসের ফলে যে বিলাসব্যসনের অভ্যাস গড়ে উঠেছিল তার অভাব-বোধ থেকে সে তারই পরিচিত নিজস্ব কুটিরকে নিরীক্ষণ করেছে। ফলে এই নিরীক্ষণের সঙ্গে মিশে গেছে তার ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির, সুবিধে-অসুবিধের হিসেব এবং এর ফলে গড়ে উঠেছে ব্যক্তিগত প্রভাব নির্ভর নিরীক্ষণ।

আবার রিমন-কেনানকে অনুসরণ করে বলা যায় বিনোদিনীর এই নিরীক্ষণের সঙ্গে নিরীক্ষকের ব্যক্তিগত আবেগ জড়িয়ে যাওয়ার ফলে এর সঙ্গে আবেগ-কেন্দ্রিক উপাদানের যোগ রয়েছে।

> **৪. নৌকাডুবি:—** "এবারে 'ঘর' বলিয়া একটা বীভৎস জিনিস কমলাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, কমলা কেমন করিয়া রক্ষা পাইবে। রমেশ যে তাহার কাছে এতবড়ো বিভীষিকা হইয়া উঠিবে, দুই দিন আগে তাহা কি কমলা স্বপ্নেও কল্পনাকরিতে পারিত? (পৃ. ৪২০) (নিরীক্ষক: কমলা। অন্তঃস্থ নিরীক্ষণ। লাক্ষণিক বা ধারণামূলক)

'চোখের বালি'-র অনতিপরে রচিত সর্বজ্ঞ-কথনরীতিতে কথিত উপন্যাস 'নৌকাডুবি'-র কাহিনি-বিন্যাস, চরিত্র-গঠন প্রভৃতি সমস্তক্ষেত্রেই সমালোচকেরা অতি-দুর্বলতার ছাপ লক্ষ করলেও কিছু কিছু নিরীক্ষণ-বিন্দুর আলোচনা এই উপন্যাসের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, উদ্ধৃত অংশের নিরীক্ষক হিসেবে রয়েছে উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র কমলা। উপন্যাসেরই চরিত্র নিরীক্ষক হওয়ার কারণে গড়ে উঠেছে অন্তঃপ্রেক্ষিত। পাশাপাশি বেশ কয়েকমাস রমেশের সঙ্গে সংসার-যাপনের পরে যখন চিঠির মাধ্যমে কমলা আচমকা জানতে পারে সে আসলে রমেশের স্ত্রী নয়, রমেশ আসলে তার পক্ষে 'পরপুরুষ' তখন থেকেই তার মধ্যে সনাতনী স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নিয়ে নানান বিধি-নিষেধের বেড়াজাল গড়ে ওঠে। ফলে এতদিন যে সংসার বাধার ভাবনায় বিমোহিত হয়ে নিজহাতে সে ঘর সাজাচ্ছিল সেই ঘরকেই মুহূর্তের মধ্যে বীভৎস মনে হতে থাকে এবং তার সমস্ত দাম্পত্য-প্রেম রমেশের থেকে অপসৃত হয়ে প্রধাবিত হতে থাকে তার অদেখা স্বামীর প্রতি। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে নিরীক্ষক কমলার কাছে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কিত আজন্ম-লালিত ধ্যান-

ধারণা, বিশ্বাস-অবিশ্বাসবোধই রমেশ এবং তার ঘরকে বিভীষিকাময় করে তুলেছে। ফলে তার এই নিরীক্ষণ হয়ে উঠেছে লাক্ষণিক বা ধারণামূলক।

আবার রিমন-কেনানকে অনুসরণ করে বলা যায় কমলার এই নিরীক্ষণের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত আবেগ জড়িয়ে যাওয়ার ফলে এর সঙ্গে আবেগ-কেন্দ্রিক উপাদানের যোগ রয়েছে।

> **৫. গোরা:— ক.** "একজন বৃদ্ধ মুসলমান মাথায় এক-ঝাঁকা ফল সবজি আণ্ডা রুটি মাখন প্রভৃতি আহার্যসামগ্রী লইয়া কোনো ইংরেজ প্রভুর পাকশালার অভিমুখে চলিতেছিল। চেন-পরা বাবুটি তাহাকে গাড়ির সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইবার জন্য হাঁকিয়াছিল, বৃদ্ধ শুনিতে না পাওয়াতে গাড়ি প্রায় তাহার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়ে। কোনোমতে তাহার প্রাণ বাঁচিল, কিন্তু ঝাঁকাসমেত জিনিসগুলা রাস্তায় গড়াগড়ি গেল এবং ক্রুদ্ধ বাবু কোচবাক্স হইতে ফিরিয়া তাহাকে 'ড্যাম শুয়ার' বলিয়া গালি দিয়া তাহার মুখের উপর সপাং করে চাবুক বসাইয়া দিতে তাহার কপালে রক্তের রেখা দেখা দিল। ...গোরা ফিরিয়া আসিয়া বিকীর্ণ জিনিসগুলা নিজে কুড়াইয়া তাহার ঝাঁকায় উঠাইতে লাগি।" (পৃ. ৫৬৯) (নিরীক্ষক: সর্বজ্ঞ-কথক। বহিঃস্থ নিরীক্ষণ। প্রত্যক্ষজ নিরীক্ষণ)

সর্বজ্ঞকথন-রীতিতে কথিত উপন্যাস 'গোরা' থেকে উদ্ধৃত উপরোক্ত অনুচ্ছেদাংশের নিরীক্ষক উপন্যাসের কথক, যিনি সর্বজ্ঞ। এই সর্বজ্ঞ কথকের অবস্থান কাহিনিতলের বাইরে, ফলে গড়ে উঠেছে বহিঃ প্রেক্ষিত এবং তার থেকে জন্ম নিয়েছে বহিঃস্থ নিরীক্ষণ। সর্বজ্ঞ কথকের এই নিরীক্ষণের মধ্যে তার কোনো আবেগ-অনুভূতি জড়িত হয়নি বলেই এই নিরীক্ষণকে প্রত্যক্ষজ নিরীক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এই অংশটিকেই রিমন-কেনানের নিরীক্ষণের ধারণার নিক্তিতে বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখব উক্ত অংশের নিরীক্ষকের অবস্থান কাহিনিতলের অনেক উর্দ্ধে বলেই বিহঙ্গ-দৃষ্টি নিয়ে সে যেমন একদিকে গোরার মুখের পেশির রদবদল দেখেছে তেমনই কোচবাক্সে থাকা বাবুর মুখের ভাষাও শুনেছে। অর্থাৎ নিরীক্ষকের অবস্থানের কারণেই তার নিরীক্ষণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জ্ঞান-কেন্দ্রিক উপাদান, অর্থাৎ এই নিরীক্ষক ঘটনা-পরিস্থিতির সমস্ত দিক সম্পর্কে সবটা জানে। আবার বহিঃস্থ অবস্থানের পরেও নিরীক্ষকের এই নিরীক্ষণের সঙ্গে মিশে গেছে ব্যক্তিগত আদর্শ। কারণ এই নিরীক্ষণ শুধু দেখা নয়, কথক-নিরীক্ষক একইসঙ্গে উচ্চবিত্তের সঙ্গে নিম্নবিত্তের সম্পর্ক, গোরার

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রভৃতির প্রতি আলোকপাতের চেষ্টা করেছে তার এই দেখার মধ্যে দিয়ে।

> **খ.** "গোরা শিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে যে ঔদ্ধত্য, যে প্রগলভতা কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল, সুচরিতার মুখশ্রীতে তাহার আভাসমাত্র কোথায়! তাহার মুখে বুদ্ধির একটা উজ্জ্বলতা নিঃসন্দেহ প্রকাশ পাইতেছিল, কিন্তু নম্রতা ও লজ্জার দ্বারা তাহা কী সুন্দর কোমল হইয়া আজ দেখা দিয়াছে! মুখের ডৌলটি কী সুকুমার! ভ্রূযুগলের উপরে ললাটটি যেন শরতের আকাশখণ্ডের মতো নির্মল ও স্বচ্ছ।..." (পৃ. ৫৮৭) (নিরীক্ষক: গোরা। অন্তঃস্থ নিরীক্ষণ। ব্যক্তিগত প্রভাব নির্ভর নিরীক্ষণ)

আবার 'চোখের বালি' থেকে চরিত্রদের মনের অন্তঃস্থল এবং ভাবনা-চিন্তার গতি-বিধি বিশ্লেষণ করার যে প্রয়াস ঔপন্যাসিক গ্রহণ করেছিলেন তা তার পরবর্তীতে রচিত উপন্যাসগুলির ক্ষেত্রেও অব্যাহত ছিল। বিশেষত উপন্যাস 'গোরা' যেমন একদিকে ঘটনা-প্রধান তেমনই একইসঙ্গে চরিত্রদের মনের বিচিত্র গতি-বিধির পর্যালোচনাও সমানভাবে গুরুত্ব পেয়েছে এই উপন্যাসে। ফলে এক-একটি ঘটনা বা পরিস্থিতিকে প্রায়শই যেমন চরিত্রদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখানো হয়েছে তেমনই সেই দৃষ্টিকোণের ব্যাখ্যায় পাওয়া যায় সর্বজ্ঞ-কথকের স্বর। যেমন উপরোক্ত অংশের নিরীক্ষক আখ্যানের কেন্দ্রীয় চরিত্র গোরা নিজে। কেন্দ্রীয় চরিত্র নিরীক্ষক, অর্থাৎ তার অবস্থান কাহিনি-তলে। ফলে গড়ে উঠেছে অন্তঃস্থ নিরীক্ষণ। পাশাপাশি গোরা যে দৃষ্টিকোণ থেকে সুচরিতাকে দেখছে সেই দৃষ্টিকোণের সঙ্গে মিশে গেছে সুচরিতাকে ভালোলাগার সূচনা-মুহূর্তটি, মিশে গেছে গোরার ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রশ্ন এবং তার ফলে গড়ে উঠেছে ব্যক্তিগত প্রভাব নির্ভর নিরীক্ষণ। এই নিরীক্ষণকেই রিমন-কেনানের ভাষায় বলা যায় 'The Emotive Component' বা নিরীক্ষকের আবেগগত দিক।

> গ. গোরা তাঁহার স্বাভাবিক ঝড়ের গতিতে মন্দিরের দিকেই গেল। দ্বারের কাছে গিয়া দেখিল্বিনয় বরদাসুন্দরীর অনুসরণ করিয়া তাঁহাদের গাড়িতে উঠিতেছে— সমস্ত রাস্তার মাঝখানে নির্লজ্জের মতো অন্য পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে এক গাড়িতে গিয়া বসিতেছে! মূঢ়! নাগপাশে এমনি করিয়াই ধরা দিতে হয়! এত সত্বর! এত সহজে! (পৃ. ৫৫৫-৫৬) (নিরীক্ষক সর্বজ্ঞকথক ও গোরা। বহিঃস্থ ও অন্তঃস্থ নিরীক্ষণ। প্রত্যক্ষজ ও ধারণামূলক নিরীক্ষণ)

ইতিপূর্বে তৃতীয় অধ্যায়ের 'সময় বিন্যাস' শীর্ষক পরিচ্ছেদে পুনরাবৃত্ত কথনের মধ্যে দেখানো হয়েছে কীভাবে উপন্যাসটির বিভিন্ন ঘটনা আখ্যানতলে একবার ঘটলেও বাচনে একাধিকবার উপস্থাপিত হয়েছে। উক্ত অংশটিও তেমনই একটি ঘটনা। বিনয় যে পরেশবাবুর পরিবারের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজে কেশবচন্দ্রের ভাষণ শুনতে গেছিল সেই বিষয়টি এখানে দেখানো হয়েছে গোরার দৃষ্টিকোণ থেকে, যার অবস্থান কাহিনিতলে হওয়ার কারণে গড়ে উঠেছে অন্তঃস্থ নিরীক্ষণ। আবার গোরার এই নিরীক্ষণের সঙ্গে মিশে গেছে একদিকে মেয়েদের নিয়ে তার স্পর্শকাতরতা এবং অন্যদিকে বিনয়কে হারানোর আশঙ্কা। ফলে এই দুই আবেগের বিমিশ্রণে গোরার নিরীক্ষণটি হয়েছে ধারণামূলক নিরীক্ষণ।

আবার গোরা যে বিনয়কে তার বাড়িতে না পেয়ে ঝড়ের গতিতে মন্দিরের দিকে চলে গেল— এই অংশের নিরীক্ষক সর্বজ্ঞ-কথক, যার অবস্থান কাহিনিতলের বাইরে, ফলে গড়ে উঠেছে বহিঃস্থ ও প্রত্যক্ষজ নিরীক্ষণ। কাজেই বোঝা যায় উক্ত অংশটিতে কীভাবে একই সঙ্গে বহিঃস্থ ও অন্তঃস্থ নিরীক্ষণের সহাবস্থান ঘটেছে।

গোরা যে বিনয়কে পরেশবাবুর পরিবারের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের দ্বার থেকে একসঙ্গে তাদের গাড়িতে উঠতে দেখল এক্ষেত্রে তা শুধু দেখাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। লক্ষ করতে হবে এরপরে বিনয়ের প্রতি তার একাকী সংলাপের সম্বোধনের শব্দগুলিকে। সে বলেছে "মূঢ়! নাগপাশে এমনি করিয়াই ধরা দিতে হয়! এত সত্বর! এত সহজে!", এই যে শব্দ বা শব্দবন্ধগুলি সে ব্যবহার করেছে তার মধ্যে দিয়ে একদিকে যেমন প্রকাশ পেয়েছে বিনয়কে দেখবার ফলে তার তৎকালীন মানসিক অভিঘাত তেমনি লক্ষ করবার মতো "নাগপাশ" শব্দটি' অর্থাৎ সে শুধু বিনয়কেই দেখেনি তার সঙ্গে দেখেছে ব্রাহ্ম পরেশবাবুর মেয়েদের যাদের প্রতি তার মনোভাব ঐ একটি শব্দের মধ্যে দিয়েই প্রকাশিত হয়ে যায়। ফলে তাত্ত্বিক উলফ স্কিমড যে বলেছেন ভাষাতত্ত্বগত নিরীক্ষণের কথা (বিস্তারিত আলোচনা পৃ. ৫১) তা গোরার এই নিরীক্ষণ এবং নিরীক্ষণের অনতিপরে তার ভাষা ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

৬. চতুরঙ্গ:— ক. "শচীশকে দেখিলে মনে হয় যেন একটা জ্যোতিষ্ক— তার চোখ জ্বলিতেছে; তার লম্বা সরু আঙুলগুলি যেন আগুনের শিখা; তার গায়ের রঙ যেন রঙ নহে,

তাহা আভা। শচীশকে যখন দেখিলাম অমনি যেন তার অন্তরাত্মাকে দেখিতে পাইলাম;..."
(পৃ.৭৯৯। (নিরীক্ষক : শ্রীবিলাস। অন্তঃস্থ নিরীক্ষণ। লাক্ষণিক বা ধারণামূলক)

ডায়ারি-ধর্মী আখ্যান 'চতুরঙ্গ' থেকে উদ্ধৃত উপরোক্ত অংশের নিরীক্ষক হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে উপন্যাসের কথক এবং একইসঙ্গে উপন্যাসের চরিত্র শ্রীবিলাসকে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে নিরীক্ষক এবং কথক একই ব্যক্তি— শ্রীবিলাস, যার অবস্থান কাহিনি-তলে। ফলে গড়ে উঠেছে অন্তঃপ্রেক্ষিত এবং অন্তঃস্থ নিরীক্ষণ। আবার নিরীক্ষণবিন্দু নিয়ে আলোচনাকালে মনে রাখতে হয় আলোচ্য উপন্যাসটির গঠনরীতি এবং সময়-বিন্যাসকেও। মনে রাখতে হয় 'চতুরঙ্গ' আসলে শ্রীবিলাসের ডায়ারি, যে ডায়ারি সে লিখেছে দামিনীকে দাহ করে আসার পরে। ফলে আমরা ভাবতে পারি শ্রীবিলাস যে মুহূর্তে প্রথমবারের জন্য শচীশকে দেখেছে ঠিক সেই মুহূর্তের অনুভূতিই যে লেখা হয়েছে সেরকমটা না হতেও পারে। নিরীক্ষকের এই নিরীক্ষণে মধ্যে মিশে গেছে শচীশকে দীর্ঘ-বছর ক্রমাগত দেখা এবং বন্ধুত্বের অভিঘাত। যার ফলে সে লিখতে পেরেছে শচীশকে দেখার মুহূর্তেই সে যেন তার অন্তরাত্মাকেও দেখে ফেলেছে। ফলে এই যে অনুভূতি, এই অনুভূতির সঙ্গে মিশে গেছে শ্রীবিলাসের ব্যক্তিগত আবেগ, ফলে গড়ে উঠেছে লাক্ষণিক বা ধারণামূলক।

আবার এই নিরীক্ষণটি বিশ্লেষণকালে মনে করতে হয় শচীশের ডায়ারির রচনাকালটিকেও, যা সে লিখেছে দামিনীকে দাহ করে আসার পরে। অর্থাৎ সে সময়টা শচীশের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের থেকে বহুদূরে অবস্থান করে। ফলে সময়ের দূরত্বে দাঁড়িয়ে শচীশের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ও তার সঙ্গজনিত প্রাথমিক প্রভাব এবং আবেগকে কাটিয়ে ফেলে সে ডায়ারিতে বর্ণনা করেছে শচীশের বাহ্যিক গড়নের। ফলে উল্ফ স্কিমড যে বলেন সময়গত নিরীক্ষণের কথা (বিস্তারিত আলোচনা পৃ. ৫১) তার দৃষ্টান্ত হিসেবে উক্ত অংশটিকে গ্রহণ করা যায়।

খ. "চারি দিকে ধূ ধূ করিতেছে, জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই। রৌদ্র যেমন নিষ্ঠুর, বালির ঢেউগুলাও তেমনি। তারা যেন শূন্যতার পাহারাওয়ালা, গুঁড়ি মারিয়া সব বসিয়া আছে।

যেখানে কোনো ডাকের কোনো সাড়া, কোনো প্রশ্নের কোনো জবাব নাই, এমন একটা সীমানাহারা ফ্যাকাশে সাদার মাঝখানে দাঁড়াইয়া দামিনীর বুক দমিয়া গেল।" (পৃ. ৮৩৩)
(নিরীক্ষক: দামিনী। অন্তঃস্থ নিরীক্ষণ। ব্যক্তিগত প্রভাব নির্ভর নিরীক্ষণ)

আবার একই আখ্যান থেকে গৃহীত উক্ত অংশের কথক শ্রীবিলাস হলেও নিরীক্ষক আখ্যানেরই অপর একটি চরিত্র দামিনী। ফলে এক্ষেত্রেও জন্ম নিয়েছে অন্তঃস্থ নিরীক্ষণ। পাশাপাশি দামিনীর এই নিরীক্ষণের সঙ্গে মিশে গেছে তার তৎকালীন মানসিক স্থিতি, তার বিশুষ্ক জীবনের প্রতিবিম্ব হয়ে উঠেছে এই নিরীক্ষণ। শচীশের থেকে ক্রমাগত প্রত্যাখ্যান তার মধ্যে যে শূন্যতার সৃষ্টি করেছিল তারই প্রতিফলন ঘটেছে তার এই নিরীক্ষণে। ফলে এক্ষেত্রে গড়ে উঠেছে ব্যক্তিগত প্রভাব নির্ভর নিরীক্ষণ।

> **৭. ঘরে-বাইরে:—** ক. "কিন্তু, সন্দীপবাবু যখন বক্তৃতা দিতে লাগলেন আর এই বৃহৎ সভার হৃদয় দুলে দুলে ফুলে ফুলে উঠে কুল ছাপিয়ে ভাসিয়ে যাবার জো হল তখন তাঁর সে এক আশ্চর্য মূর্তি দেখলুম। ... কেবল এক সময় দেখলুম কালপুরুষের নক্ষত্রের মতো সন্দীপবাবুর উজ্জ্বল দুই চোখ আমার মুখের উপর এসে পড়ল।..." (পৃ. ৮৫৭) (নিরীক্ষক: বিমলা। অন্তঃস্থ নিরীক্ষণ। ব্যক্তিগত প্রভাব নির্ভর নিরীক্ষণ)

যৌগিক রীতির আত্মকথনে কথিত উপন্যাস 'ঘরে-বাইরে' থেকে গৃহিত উদ্ধৃতাংশের নিরীক্ষক হিসেবে পাওয়া যায় উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিমলাকে, যার অবস্থান কাহিনি তলে। ফলে গড়ে উঠেছে অন্তঃপ্রেক্ষিত এবং অন্তঃস্থ নিরীক্ষণ। আবার প্রথমাবধি ব্যক্তিগতভাবে সন্দীপকে অপছন্দ করে আসা বিমলার পক্ষে সন্দীপের প্রথম বক্তৃতায় উপস্থিত থেকেই তাকে নায়কোচিত পদে অধিষ্ঠানের মধ্যে আসলে মিশে গেছে তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতির দোলায় আন্দোলিত বিমলার মানসিক স্থিতি। চরমপন্থী স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে প্রভাবিত বিমলার অবচেতন মন একজন তীব্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উগ্র পৌরুষযুক্ত যুগনায়ককে অন্বেষণ করেছিল— যা প্রকৃতপক্ষে সে তার স্বামী নিখিলেশের মধ্যে পায়নি। কাজেই সেই অবচেতন মনের অন্বেষণ এবং অপ্রাপ্তিই একদা তীব্র অপছন্দের মানুষকেও নায়ক করে তুলেছে। বক্তৃতা প্রদানকালে সন্দীপকে দেখার মধ্যে মিশে গেছে বিমলার ব্যক্তিগত ধারণা, আকাঙ্ক্ষা ফলে এটি হয়ে উঠেছে ব্যক্তিগত প্রভাব নির্ভর নিরীক্ষণ। একেই রিমন কেনানের ধারণা অনুযায়ী বলা যায় নিরীক্ষণের আবেগ কেন্দ্রিক উপাদান।

একই রকমভাবে প্রথম চাক্ষুষ করা এবং বক্তৃতায় মুগ্ধ বিমলার দ্বারা সন্দীপের চোখের বর্ণনাকালে ব্যবহৃত শব্দবন্ধ এক্ষেত্রে মনে রাখার মতো। সে সেই চোখকে

দেখেছে কালপুরুষ নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল। জ্যোতিষশাস্ত্র থেকে দেখব এই কালপুরুষেরই অপর নাম 'The Orion', বা যাকে বলা যায় ব্যাধ (https://g.co/kgs/9brjCc)। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হয় বিমলার আত্মকথাও পূর্ববর্তী উপন্যাসের শ্রীবিলাসের মতোই লেখা হয়েছে ঘটনাধারা অতিক্রম করে যাওয়ার পরে। ফলে প্রাথমিকভাবে সন্দীপের প্রতি বিমলার প্রাথমিক মুগ্ধতা এবং সন্দীপের স্বরূপ সম্পর্কিত সচেতনতা এই দুই-ই 'কালপুরুষ' শব্দটির মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হতে পেরেছে সন্দীপের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের অভিঘাতটি মিলিয়ে যাওয়ার ফলে। বিমলার এই বিশেষণ প্রয়োগকে স্কিমডের মতানুযায়ী ভাষাতত্ত্বগত নিরীক্ষণের ফল বলে প্রাথমিকভাবে মনে হলেও তা প্রকৃতপক্ষে সত্য নয়। উপন্যাসের গভীর পাঠে বুঝি সন্দীপের এই ব্যাধ-প্রবৃত্তি, তার নারী-শিকার করার প্রবণতাকে ঘিরে যুগপৎ তার নিজের ও বিমলার আত্মকথায় নানান মন্তব্য ফিরে ফিরে এসেছে। ফলে বিমলার এই নিরীক্ষণ ও তার সঙ্গে ব্যবহৃত শব্দবন্ধ যখন সে তার আত্মকথায় প্রয়োগ করেছে তখন আসলে সন্দীপের প্রকৃতি সম্পর্কে সে সচেতন। কাজেই স্কিমডের মতানুযায়ী এটি হয়ে উঠেছে সময়গত নিরীক্ষণের ফসল।

> খ. "আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম বিমলা আমার কাছ থেকে কাজ আদায় করবার জন্যে বিশেষ করে সাজ করেছে। আজকের দিনের পূর্ব পর্যন্ত আমি কখনোই বিমলাকে এবং বিমলার সাজকে তফাত করে দেখি নি। আজ ওর বিলিতি খোঁপার চূড়াকে কেবলমাত্র চুলের কুণ্ডলী বলেই দেখলুম; শুধু তাই নয়, একদিন এই খোঁপা আমার কাছে অমূল্য ছিল, আজ দেখি এ সস্তা দামে বিকোবার জন্যে প্রস্তুত।" (নিরীক্ষক: নিখিলেশ। অন্তঃস্থ নিরীক্ষণ। লাক্ষণিক নিরীক্ষণ)

উক্ত অংশের নিরীক্ষক হিসেবে আমরা পাচ্ছি নিখিলেশকে, যে আখ্যানের তিনটি প্রধান চরিত্রের অন্যতম। অর্থাৎ, নিরীক্ষকের অবস্থান কাহিনিতলে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ের আলোচনায় দেখা গিয়েছে এই খোঁপার প্রসঙ্গ উপন্যাসে দু'বার উঠে এসেছে। একবার বিমলার দিক থেকে এবং আরেকবার নিখিলেশের প্রেক্ষিত থেকে। নিখিলেশ যে বিমলার এই সাজকে দেখছে তার মধ্যে দিয়ে সে উপলব্ধি করেছে যে এই কেশবিন্যাস অকারণ নয়, সে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে নিখিলেশের দুর্বল জায়গায় আঘাত করে কাজ আদায় করতে চেয়েছে। কাজেই বিমলার এই বিলিতি খোঁপার সঙ্গে স্বার্থ জুড়ে যাওয়ার বেদনা যেমন একদিকে কাজ করেছে তেমনই নিখিলেশ একইসঙ্গে পেয়েছে স্বস্তি। এই যে তার

উক্তি ‘ওর বিলিতি খোঁপার চূড়াকে কেবলমাত্র চুলের কুণ্ডলী বলেই দেখলুম’— এই উক্তি একই সঙ্গে বেদনা ও বিবিক্ততার অনুভব নিয়ে আসে। কাজেই নিখিলেশের এই নিরীক্ষণের মধ্যে তার আদর্শ, ধ্যান-ধারণা মিশে গিয়ে সৃষ্টি করেছে লাক্ষণিক বা ধারণামূলক নিরীক্ষণের।

আবার রিমন-কেনানের মত অনুযায়ী এই নিরীক্ষক যেহেতু অন্তঃস্থ, তাই তার নিরীক্ষণ কোনোভাবেই নিরপেক্ষ হতে পারে না, অন্তঃস্থ নিরীক্ষকের আবেগ-অনুভূতি মিশে যায় তার নিরীক্ষণের মধ্যে। কাজেই এই হিসেবে নিখিলেশের এই নিরীক্ষণের সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে তার ব্যক্তিগত আবেগ-কেন্দ্রিক উপাদান।

> **৮. যোগাযোগ:—** ক. “একটু পরেই আস্তে আস্তে দরজা খুলে গেল। কুমুদিনী বেরিয়ে এল যেন স্বপ্নে-পাওয়া। যে কাপড় পরা ছিল তাই আছে; এ তো রাত্রে শোবার সাজ নয়। গায়ে একখানা প্রায় পুরো হাতা-ওয়ালা ব্রাউন রঙের সার্জের জামা, একটা লালপেড়ে বাদামি রঙের আলোয়ানের আঁচল মাথার উপর টেনে দেওয়া। দরজার একটা পাল্লায় বাঁ হাত রেখে যেন কী দ্বিধার ভাবে দাঁড়িয়ে রইল— একখানি অপরূপ ছবি!” (পৃ. ১০৩৩)
> (নিরীক্ষক: মধুসূদন। অন্তঃস্থ নিরীক্ষণ। লাক্ষণিক বা ধারণামূলক নিরীক্ষণ)

সর্বজ্ঞ-কথকের বয়ানে কথিত উপন্যাস ‘যোগাযোগ’-এ রবীন্দ্রনাথের প্রথম-পর্যায়ের উপন্যাসগুলির মতো সর্বজ্ঞ-কথকের বহিঃস্থ নিরীক্ষণ প্রাধান্য পেলেও আলোচ্য উপন্যাস থেকে গৃহীত উদ্ধৃতাংশের নিরীক্ষক উপন্যাসের চরিত্র মধুসূদন, যার অবস্থান কাহিনি-তলেই। ফলে এক্ষেত্রে গড়ে উঠেছে অন্তঃস্থ নিরীক্ষণ। পাশাপাশি মধুসূদন যে বিন্দু থেকে কুমুকে নিরীক্ষণ করেছে সেই বিন্দুতে এসে মিশেছে কুমুকে নিয়ে গড়ে ওঠা তার মোহ, আশা, আকাঙ্ক্ষা এবং একই সঙ্গে তার ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা। যে ধারণা থেকে সে ঠিক করে নিয়েছে নববধূর পক্ষে কোনটা রাত্রিকালীন সাজের সঠিক মাত্রা এবং কোনটা নয়। আবার এই ব্যক্তিগত ধারণার উর্দ্ধে অবস্থান করছে কুমুকে ঘিরে গড়ে ওঠা মুগ্ধতাও। ফলে এক্ষেত্রে একই সঙ্গে এই নিরীক্ষণ হয়ে উঠেছে আক্ষরিক এবং ব্যক্তিগত প্রভাব নির্ভর নিরীক্ষণের যুগ্ম উদাহরণ। রিমন-কেনানের ধারণা অনুযায়ী দেখলে দেখব মধুসূদনের এই নিরীক্ষণের সঙ্গে মিলে গেছে কুমুকে ঘিরে তার মুগ্ধতাও, অর্থাৎ

নিরীক্ষকের আবেগ মিশে গেছে ফলে একে নিরীক্ষণের আবেগ-কেন্দ্রিক উপাদানের সঙ্গে সম্পর্কিত করা যায়।

> খ. মধুসূদন দেখতে কুশ্রী নয় কিন্তু বড়ো কঠিন। কালো মুখের মধ্যে যেটা প্রথমেই চোখে পড়ে সে হচ্ছে পাখির চঞ্চুর মতো মস্ত বড়ো বাঁকানো নাক, ঠোঁটের সামনে পর্যন্ত ঝুঁকে পড়ে যেন পাহারা দিচ্ছে। প্রশস্ত গড়ানে কপাল ঘন ভ্রূর উপর বাধাপ্রাপ্ত স্রোতের মতো স্ফীত। সেই ভ্রূর ছায়াতলে সংকীর্ণ তীর্যক চক্ষুর দৃষ্টি তীব্র। গোঁফদাড়ি কামানো, ঠোঁট চাপা, চিবুক ভারী। ... হাত দুটো রোমশ ও দেহের তুলনায় খাটো। সবসুদ্ধ মনে হয় মানুষটা একেবারে নিরেট; মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বদাই কী একটা প্রতিজ্ঞা যেন গুলি পাকিয়ে আছে। (পৃ. ৯৯১) (নিরীক্ষক: সর্বজ্ঞকথক। বহিঃস্থ নিরীক্ষণ। ব্যক্তিগত প্রভাব নির্ভর নিরীক্ষণ)

আবার উক্ত অংশের নিরীক্ষক হিসেবে পাচ্ছি উপন্যাসটির সর্বজ্ঞ-কথককে। যার অবস্থান কাহিনিতলের বাইরে হওয়ার ফলে বহিঃস্থ নিরীক্ষণের জন্ম হয়েছে। কিন্তু কথক-নিরীক্ষকের এই নিরীক্ষণ নিরপেক্ষ নয়। সমগ্র উপন্যাস পাঠে বোঝা যায় যুগপৎ নিহিত লেখক এবং প্রকৃত লেখকের সমস্ত সহানুভূতি পেয়েছে কুমু আর তার পূর্বপুরুষেরা। এই সহানুভূতি ও পক্ষপাতিত্বের ছাপ ফুটে উঠেছে মধুসূদনের বাহ্যিক গঠন বর্ণনার মধ্যে দিয়েও। কুমু অথবা বিপ্রদাসের সমান্তরালে মধুসূদনের চেহারার গঠন বর্ণনাকালের শব্দ চয়ন বুঝিয়ে দেয় কথক আসলে পক্ষপাতিত্ব করে ফেলেছে। ফলে এই নিরীক্ষণ হয়েছে ব্যক্তিগত প্রভাব নির্ভর।

আবার রিমন-কেনানের ধারণা অনুযায়ী বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যাবে নিরীক্ষক যেহেতু বহিঃস্থ তাই তার অবস্থান কাহিনি তলের অনেক উপরে। ফলে সে বিহঙ্গ-দৃষ্টি নিয়ে একদিকে যেমন কুমু-মধুসূদনের বিবাহ-কর্ম নিরীক্ষণ করে তেমনই একই সময়ে একই সঙ্গে কুমুর মুখমণ্ডল ও মধুর চেহারার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিতে পারে। ফলে নিরীক্ষকের এই অবস্থানের ফলে তার দৃষ্টি সীমা হয়েছে বিস্তৃত এবং নিরীক্ষণের সঙ্গে মিশে গেছে নিরীক্ষকের স্থানিক সম্পর্ক।

> **৯. শেষের কবিতা:—** "চৌকি টেবিল শেলফ আছে, সেই বইগুলি নেই। মেজের উপর দুই-একটা শূন্য ছেঁড়া লেফাফা, তার উপরে অজানা হাতের অক্ষরে লাবণ্যর নাম ও ঠিকানা লেখা; দু-চারটে ব্যবহার করা পরিত্যক্ত পেনের নিব এবং ক্ষয়প্রাপ্ত একটি অতি

ছোটো পেনসিল টেবিলের উপরে;...” (পৃ. ১১৬৬) (নিরীক্ষক : অমিত। অন্তঃস্থ নিরীক্ষণ। স্থানান্তরিত বা ব্যক্তিগত প্রভাব নির্ভর দৃষ্টিকোণ)

মিশ্র-কথন রীতিতে কথিত উপন্যাস ‘শেষের কবিতা’ থেকে উদ্ধৃত উপরোক্ত অংশের নিরীক্ষক আখ্যানের চরিত্র অমিত, যার অবস্থান কাহিনিতলে অর্থাৎ নিরীক্ষণটি ঘটেছে অন্তঃপ্রেক্ষিত থেকে, ফলে গড়ে উঠেছে অন্তঃস্থ নিরীক্ষণ। আবার লাবণ্যের উপস্থিতিকে আকাঙ্ক্ষা করে তারই একদা বাস করা পরিত্যক্ত ঘরকে নিরীক্ষণের মধ্যে মিশে গেছে অমিতের ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্খা, ফলে গড়ে উঠেছে ব্যক্তিগত প্রভাবনির্ভর দৃষ্টিকোণ।

অন্তঃস্থ নিরীক্ষক হওয়ার ফলে অমিতের দৃষ্টি সীমাবদ্ধও থেকেছে একটি মাত্র ঘরের মধ্যে, এই সীমাবদ্ধ নিরীক্ষণকে রিমন-কেনান নিরীক্ষণের উপলব্ধিগত উপাদানের সঙ্গে সম্পর্কিত করেছেন। আবার অমিতের নিরীক্ষণের সঙ্গে তার আবেগ মিশ্রিত হওয়ার ফলে রিমন কেনানের নিক্তি অনুযায়ী এই নিরীক্ষণের সঙ্গে আবেগগত দিকের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে।

১০. দুই বোন:— “হায় রে, আজ ওর স্বামীর এ কী পরাভব দিনে দিনে প্রকাশ হয়ে পড়ছে। ...শশাঙ্কের মুখ দেখলেই বুঝতে পারে, সে যেন সর্বদাই কেমন আবিষ্ট হয়ে আছে। ঐ একরত্তি মেয়েটা এসে অল্প এই ক’দিনেই এত বড়ো সাধনার আসন থেকে ঐ কর্মকঠিন পুরুষকে বিচলিত করে দিলে।” (পৃ. ১১৯৭) (নিরীক্ষক: শর্মিলা। অন্তঃস্থ নিরীক্ষণ। স্থানান্তরিত বা ব্যক্তিগত প্রভাব নির্ভর দৃষ্টিকোণ)

সর্বজ্ঞকথকের বয়ানে কথিত উপন্যাস ‘দুই বোন’-এর নিরীক্ষণ বা দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে বিশ্লেষণকালে মনে রাখতে হয় ঔপন্যাসিক জীবনের শেষপর্বে রচিত ক্ষুদ্রাকার উপন্যাসগুলির গঠন নিয়ে খুব বেশি আলোচনা না হলেও এবং সর্বজ্ঞ-কথকের বয়ানে কথিত হলেও এই উপন্যাসগুলির গঠন পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলির তুলনায় অনেকাংশেই পৃথক। এবং গঠনগত এই পার্থক্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হল নিরীক্ষণের ব্যবহার। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এই শেষপর্বের ক্ষুদ্র-উপন্যাসগুলিতে সর্বজ্ঞ-কথকের সর্বজ্ঞতার মাত্রা অনেকাংশে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে, ঘটনাগুলি অধিকাংশক্ষেত্রেই দেখানো হয়েছে চরিত্রদের দৃষ্টিকোণ থেকে, অথবা চরিত্রদের মনের মধ্যে গড়ে ওঠা পশ্চাৎ-উদ্ভাসের মাধ্যমে। যেমন, ‘দুই বোন’ উপন্যাস থেকে উদ্ধৃত অংশের নিরীক্ষক উপন্যাসের চরিত্র

শর্মিলা, যার অবস্থান কাহিনিতলেই। ফলে গড়ে উঠেছে অন্তঃস্থ নিরীক্ষণ। ক্রমে ক্রমে নিজেরই বোন ঊর্মিমালার মোহে আবদ্ধ পতঙ্গের মতো সর্বদা কর্মরত স্বামীর কর্মে বিরতি এবং মদমত্ত অবস্থা নিরীক্ষণের মধ্যে মিশে গেছে নিরীক্ষকের ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির চিন্তা; কারণ স্বামীর স্বরূপ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল শর্মিলা ইতিমধ্যেই জানে যার মোহে পড়ে স্বামী কর্তব্যে অবহেলা করছে, যখন সেই অবহেলার ফলস্বরূপ ক্ষতির বোঝা তার সামনে এসে পড়বে তখন সে তার মোহের আধারকেই দুষবে, নিজের গাফিলতিকে নয়। ফলে সহোদরা এবং স্বামীর সম্পর্কের মাঝে পিষ্ট হতে থাকা শর্মিলার এই দৃষ্টিকোণ হয়ে উঠেছে ব্যক্তিগত প্রভাব নির্ভর দৃষ্টিকোণের উদাহরণ।

> **১১. মালঞ্চ:—** "পুব দিকের জানলা খোলা। দেখা যায় নীচের বাগানে অর্কিডের ঘর, ছিটে বেড়ায় তৈরি; বেড়ার গায়ে গায়ে অপরাজিতার লতা। অদূরে ঝিলের ধারে পাম্প চলছে, জল কুলকুল করে বয়ে যায় নালায় নালায়, ফুলগাছের কেয়ারির ধারে ধারে। গন্ধনিবিড় আমবাগানে কোকিল ডাকছে যেন মরিয়া হয়ে। বাগানের দেউড়িতে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজল বেলা দুপুরের। ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্রের সঙ্গে তার সুরের মিল। তিনটে পর্যন্ত মালীদের ছুটি। ঐ ঘণ্টার শব্দে নীরজার বুকের ভিতরটা ব্যথিয়ে উঠল, উদাস হয়ে গেল তার মন।" (পৃ. ১২১৩) (নিরীক্ষক: নীরজা। অন্তঃপ্রেক্ষিত। স্থানান্তরিত বা ব্যক্তিগত প্রভাব নির্ভর দৃষ্টিকোণ)

'দুই বোন'-এর নিরীক্ষণ আলোচনাকালে যে বিষয়গুলির উল্লেখ করা হয়েছিল তা আরও বেশি প্রকট হয়েছে 'মালঞ্চ' উপন্যাসে এসে। এখানে সর্বজ্ঞ-কথকের বয়ানের সিংহভাগই প্রকৃতপক্ষে নীরজার রোগশয্যায় শায়িত অবস্থান থেকে নিরীক্ষা ও ভাবনার বহিঃপ্রকাশ। ফলে, উপন্যাসটি সর্বজ্ঞকথকের বয়ানে কথিত হলেও প্রাধান্য পেয়েছে নীরজার দৃষ্টিকোণ, তার ভাবনার অন্তঃস্থল। যেমন, উপন্যাসটি থেকে গৃহিত উক্ত অংশের নিরীক্ষক উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র নীরজা, যার অবস্থান কাহিনি-তলে। নিরীক্ষকের অবস্থান কাহিনিতলে হওয়ার কারণে গড়ে উঠেছে অন্তঃস্থ নিরীক্ষণ। এই যে নিরীক্ষণ সে করেছে তার ফলে তার মনের মধ্যে ভেসে উঠেছে তার বিগত সুখ-স্মৃতির নানান উদ্ভাস। অর্থাৎ, রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায় নীরজার এই বাগান নিরীক্ষণ তার মনে পশ্চাত-উদ্ভাসের ক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করেছে। আবার, উক্ত অংশের কথক যিনি তিনি সর্বজ্ঞ, ফলে মালীদের ছুটির ঘণ্টায় যে নীরজার বুক ব্যথিয়ে উঠেছে সে সম্পর্কেও তিনি জ্ঞাত।

১২. চার অধ্যায়:— "এলা একবার চারি দিক ঘুরে দেখলে। মেঝের উপর কম্বল, তার উপর চাটাই। বালিশের বদলে বই দিয়ে ভরা একটা পুরানো ক্যাম্বিসের থলি। লেখাপড়া করবার জন্যে একখানা প্যাকবাক্স। কোণে জলের কলসি মাটির ভাঁড় দিয়ে ঢাকা। জীর্ণ চাঙারিতে একছড়া কলা, তার মধ্যে এনামেল উঠে-যাওয়া একখানা বাটি, দৈবাৎ সুযোগ ঘটলে চা-খাওয়া চলে। ..." (পৃ. ১২৭৫) (নিরীক্ষক: এলা। অন্তঃপ্রেক্ষিত। স্থানান্তরিত বা ব্যক্তিগত প্রভাব নির্ভর দৃষ্টিকোণ)

সর্বজ্ঞকথকের বয়ানে কথিত রবীন্দ্রনাথের শেষতম উপন্যাস 'চার অধ্যায়' থেকে গৃহিত উপরোক্ত অংশের নিরীক্ষক উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র এলা, যার অবস্থান কাহিনি-তলে। নিরীক্ষকের অবস্থান কাহিনিতলে হওয়ার দরুন এক্ষেত্রেও গড়ে উঠেছে অন্তঃস্থ নিরীক্ষণ। আবার অতীনের এই গোপন আবাসের শ্রী অবলোকন এবং নিরীক্ষণের মধ্যে এসে মিশেছে এলার অতীনের প্রতি ভালোবাসা এবং তজ্জনিত ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতি, বিষাদ-বেদনা। ফলে এলার এই নিরীক্ষণ হয়ে উঠেছে ব্যক্তিগত প্রভাব নির্ভর দৃষ্টিকোণের উদাহরণ।

এই দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে লিচ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন তাঁর গ্রন্থে।

> "The term 'point of view' has often been used in novel criticism to refer to the various factors of discourse situation already discussed. We can define DISCOURSAL POINT OF VIEW as the relationship, expressed through discourse structure, between the implied author or some other addresser, and the fiction…. We have already seen how an author can make his attitude towards character and action clear by direct address; but the author's point of view can also be given 'bias' within narration itself by the use of language which, either in its sense or its connotations, express some element of value." (Leech and Short. 2007. P.218-19)

অর্থাৎ, দৃষ্টিকোণ বিষয়টি আখ্যানের গঠনগত দিকটির সমালোচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আলোকপাতে সহায়তা করে। কথনরীতির মতোই কথকের কেন্দ্রীয় দৃষ্টিকোণ পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে এবং বিষয়টি কথকের ভাষা প্রয়োগের মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়। লিচের উক্ত মন্তব্যের সত্যতা অত্যন্ত বেশি করে দৃষ্টগোচর হয় রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলি আলোচনাকালে।

কথনরীতির আলোচনাকালে যেমন দেখানো হয়েছে যে কীভাবে নিহিত লেখক এবং প্রকৃত লেখকের ব্যক্তিগত বিশ্বাস-অবিশ্বাসের স্বর চরিত্রদের মধ্যে মিশে যায় সেই একইরকমভাবে দেখানো যায় যে কীভাবে কথকের দৃষ্টিকোণ পাঠকের মনে পক্ষপাতমূলক পাঠ-প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। তৃতীয় অধ্যায়ে 'চরিত্র-বিন্যাস' শীর্ষক পরিচ্ছেদে উপন্যাস বিশেষে এক-একটি চরিত্রকে যে কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, কিংবা সাধারণভাবে চরিত্র-বিশ্লেষণকালে কোনো চরিত্রকে ভালো অথবা মন্দ হিসেবে বিবৃত করা হয় তার পেছনে থাকে কথক-নির্দেশিত দৃষ্টিকোণ, যে দৃষ্টিকোণের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পাঠক আখ্যানের চরিত্রদের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়েন। কথকের দৃষ্টিকোণ নির্দেশ করে দেয় ব্যক্তি লেখকের নির্দিষ্ট চরিত্রের প্রতি পক্ষপাতের প্রসঙ্গকেও। ব্যক্তিলেখকের ব্যক্তিগত নীতি, বিশ্বাস, ধারণার প্রতিফলন দেখা যায় কথক এবং প্রধান চরিত্রদের মধ্যে। যেমন, 'বউ-ঠাকুরানীর হাট'-এর উদয়াদিত্য, 'রাজর্ষি'-র গোবিন্দমাণিক্য, 'চোখের বালি'-র বিনোদিনী ও বিহারী, 'গোরা'-র পরেশবাবু, গোরা, সুচরিতা, কিংবা 'ঘরে-বাইরে'-র নিখিলেশের প্রতিই যে লেখকের পক্ষপাত তা অত্যন্ত স্পষ্ট করে বোঝা যায় চরিত্রগুলির পরিবেশন এবং আখ্যানতলে তাদেরকে যে যে দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে তার থেকেও। 'যোগাযোগ' আসলে দুই বনেদি পরিবারের বনেদিয়ানা কেন্দ্রিক দ্বন্দ্বের ফসল হলেও লেখক এবং কথকের সমস্ত সহানুভূতি যে কুমু এবং তার পরিবার পেয়েছে তা নিয়ে সমালোচকমহলে বিস্তর সমালোচনা ইতিপূর্বে বহুবার হয়েছে। এই যে পক্ষ নির্বাচন করে নেওয়া, চরিত্রদের এবং তাদের মতামতকে দ্বিধা-বিভক্ত করে দেওয়া এবং সেই দ্বিবিভাজন থেকে পাঠককে স্বপক্ষ নির্বাচনে চালিত করার মধ্যে লেখক এবং কথকের সত্তা সুস্পষ্ট হয়ে জেগে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির বাচনের আলোচনা যে শুধুমাত্র নিহিত লেখক এবং কথকের অংশ গ্রহণেই শেষ হয়ে যায় না দৃষ্টিকোণের আলোচনার উপান্তে এসে তার আরও একটি কারণ সম্পর্কে দিক-নির্দেশ করা গেল।

(গ) ভাষা ব্যবহার

গবেষণা সন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ের আলোচনাকালে দেখানো হয়েছে রিমন-কেনান কীভাবে তাঁর গ্রন্থের 'Speech Representation' অধ্যায়ে প্লেটোর 'রিপাবলিক' গ্রন্থের থেকে তাঁর উদ্ভাবিত বাচন সম্পর্কিত দুই বিখ্যাত ধারণা 'Diegesis' এবং 'Mimesis'-এর প্রসঙ্গের প্রেক্ষিতে আখ্যানে ব্যবহৃত নানান ধরনের কথনকে বিভাজিত করেছেন (Kenan. 1980. P.106-116)। পাশ্চাত্য দার্শনিক এবং তাত্ত্বিকদের দিক থেকে এই বিষয়টি নিয়ে আলোকপাত করতে গেলে দেখা যাবে অধিকাংশ তাত্ত্বিকই প্লেটোর বাচন সম্পর্কিত এই দুই ধারণার ওপর নির্ভর করেই তাঁদের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। বিষয়টি নিয়ে সন্দর্ভপত্রের প্রথম অধ্যায়ে যথাসম্ভব আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে (বিস্তারিত আলোচনা পৃ. ৫৫-৬৩) ফলে এই পরিচ্ছেদে মুখ্যত রবীন্দ্র-উপন্যাসের ভাষা ব্যবহারকে আখ্যানতত্ত্বের নিরিখে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হবে।

আমরা ইতিমধ্যে জানি, প্লেটোর বাচন সম্পর্কিত দুই ধারণার ওপর নির্ভর করে আখ্যানতাত্ত্বিকগণ আখ্যানের বাচন অংশকে মূলত তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। এগুলি হল—

(ক) প্রত্যক্ষ বাচন (Direct Discourse)

(খ) পরোক্ষ বাচন (Indirect Discourse)

(গ) মুক্ত পরোক্ষ বাচন (Free Indirect Discourse)

সন্দর্ভপত্রের প্রথম অধ্যায়ের আলোচনা থেকে জানা গেছে প্রত্যক্ষ বাচন হল আখ্যানের সংলাপ অংশ, পরোক্ষ বাচন হল কথকের বাচন এবং মুক্ত পরোক্ষ বাচন হল কথকের বাচন যেখানে চরিত্রদের সংলাপ বিগর্ভিত হয়। বাচন সম্পর্কিত এই প্রাথমিক ধারণাকে (বিস্তারিত আলোচনা পৃ. ৫৫-৬৩) মাথায় রেখে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলিতে বাচনের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

(ক) প্রত্যক্ষ বাচন:— এটি হল আখ্যানের সংলাপ অংশ। অর্থাৎ আখ্যানভাগে চরিত্রদের পারস্পরিক কথোপকথন হল প্রত্যক্ষ বাচনের উদাহরণ। রবীন্দ্রনাথের যে উপন্যাসগুলি

নিয়ে সন্দর্ভপত্র গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে সেগুলির মধ্যে থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশের উদাহরণ তুলে প্রত্যক্ষ বাচনের বিষয়টি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা নেওয়া যেতে পারে।

আবার প্রত্যক্ষ বাচন বলতে যেহেতু সংলাপ অংশকে বোঝায় তাই আমরা একই সঙ্গে দেখে নিতে পারি উপন্যাসের চরিত্ররা কে কীভাবে কথা বলে। উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র যে একইভাবে কথা বলে না তা তাদের সংলাপ থেকে আমরা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব।

১. বউ-ঠাকুরানীর হাট:— রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক জীবনের একদম প্রথমপর্বের এই উপন্যাসের সংলাপ-সজ্জার ক্ষেত্রেও বঙ্কিমী প্রভাব উপলব্ধি করা যায়। উপন্যাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠে খেয়াল করা যায় বহুক্ষেত্রে চরিত্রদের পারস্পরিক সংলাপ নাটকের সংলাপের আকারে সাজানো হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়;

> "পাঠান। হাঁ, মহারাজ, এতক্ষণে নিকাশ হইয়া গেছে।
>
> প্রতাপাদিত্য। সে কী রকম কথা? তবে তুমি জান না?
>
> পাঠান। আজ্ঞা হাঁ, জানি। কাজ নিকাশ হইয়াছে, তাহাতে আর ভুল নাই, তবে আমি সে সময় উপস্থিত ছিলাম না।" (ঠাকুর। ১৪২৫। পৃ. ১৯)

উপন্যাসটির প্রত্যক্ষবাচনের অর্থাৎ সংলাপ আদান-প্রদানের উল্লেখের পরে আমরা আলোকপাত করতে পারি উল্লেখযোগ্য চরিত্রদের সংলাপের প্রতি।

> **অ. উদয়াদিত্য:—** "উদয়াদিত্য কহিলেন, " না মহারাজ, আমি যোগ্য নহি। আমি আপনার রাজ্য চাহি না। সিংহাসন হইতে আমাকে অব্যাহতি দিন, এই ভিক্ষা।" (পৃ. ৯৩)
>
> **আ. প্রতাপাদিত্য:—** "প্রতাপাদিত্য বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "দোষের কথা হইতেছে না। সেরি যে হইতেছে তাহার একটা কারণ আছে? তুমি কী অনুমান কর, তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।" (পৃ. ১৯)
>
> **ই. বিভা:—** "বিভা কহিল, "শিবিকা কেন? আমি কি রানী যে শিবিকা চাই। আমি একজ সামান্য প্রজার মতো, একজন ভিখারিনীর মতো যাইব, আমার শিবিকায় কাজ কী?" (পৃ. ৯৭)

ঈ. সুরমা:— "সুরমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "আমার বিশ্বাস, সংসারে যাহার কেহই সহায় নাই, নারায়ণ তাহার অধিক সহায়। হে প্রভু, তোমার নামে কলঙ্ক যেন না হয়। এ বিশ্বাস আমার ভাঙিয়ো না।" (পৃ. ১১)

উ. বসন্ত রায়:— "বসন্ত রায় গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "এ সংসারে কাহারও দয়ামায়া নাই, এসো সাহেব, তোমার আদেশ পালন করো।" (পৃ. ৯২)

ঊ. রামমোহন মাল:— "...মা তোমায় একবার দেখিতে আসিলাম।" (পৃ. ৩১)

ঋ. রুক্মিণী:— "অবশেষে রুক্মিণী সহসা বলিয়া উঠিল, "বটে। তোদের এখনো সর্বনাশ হইল না আর আমি মরিব!"(পৃ. ৮৩)

উল্লিখিত প্রতিটি চরিত্রের সংলাপের প্রতি আলোকপাত করলে দেখা যাবে উপন্যাসে একমাত্র প্রতাপাদিত্য এবং রুক্মিণী ব্যতীত সমস্ত চরিত্রই যে অতি কোমল স্বভাবের তা তাদের শব্দচয়ন এবং কথক নির্দেশিত বাক্যাংশের থেকেও বোঝা যায়। পূর্বোক্ত দুটি চরিত্রকে বাদ দিলে বাকি চরিত্রদের তাদের সংলাপের থেকে পৃথক করা মুশকিল হয়। এই কারণেই সমালোচকেরা রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের উপন্যাসের চরিত্রদের মধ্যে পুতুল ধর্মীতা লক্ষ করেছিলেন।

২. রাজর্ষি:— পূর্ববর্তী উপন্যাসের মতো এই উপন্যাসেও ক্ষেত্র বিশেষে নাটকের আকারে চরিত্রদের সংলাপ সাজানো হয়েছে। উল্লেখ করা যায়,

জয়সিংহ। মা আপনার প্রতি অপ্রসন্ন হইয়াছেন।

রাজা। কেন, আমি তাঁর অসন্তোষের কাজ কী করিয়াছি?

জয়সিংহ। মহারাজ বলি বন্ধ করিয়া দেবীর পূজার ব্যাঘাত করিয়াছেন। (পৃ. ১১৫)

এরই পাশাপাশি আমরা আলোকপাত করতে পারি উল্লেখযোগ্য চরিত্রদের সংলাপের প্রতি।

অ. গোবিন্দমাণিক্য:— ..."ঠাকুর, আশীর্বাদ করুন, রাজ্যের অকুশল না ঘটুক। এ রাজ্যে মায়ের সকল সন্তান যেন সদ্ভাবে প্রেমে মিলিয়া থাকে, এ রাজ্যে ভাইয়ের কাছ হইতে ভাইকে কেহ যেন কাড়িয়া না লয়, যেখানে প্রেম আছে সেখানে কেহ যেন হিংসার প্রতিষ্ঠা না করে।..." (পৃ. ১২১)

আ. রঘুপতি:— ক. রঘুপতি তাঁহার অঙ্গারনয়নে নক্ষত্ররায়ের মর্মস্থান পর্যন্ত দগ্ধ করিয়া পাগলের মতো বলিলেন, "রক্ত কোথায়?" (পৃ. ১২৮)

খ. রঘুপতি কহিলেন, "আমার আর দুঃখ নাই— আমি শান্তি পাইয়াছি।" (পৃ. ১৮১)

ই. নক্ষত্ররায়:— ক. নক্ষত্ররায় কহিলেন, "আপনি কি মিথ্যা কথা বলিতেছেন? সে কেমন করিয়া হইবে? দেখুন ঠাকুরমশায়, আমি কাল ব্যাঙের স্বপ্ন দেখিয়াছি। আচ্ছা ব্যাঙের স্বপ্ন দেখিলে কী হয় বলুন দেখি।" (পৃ. ১০৯)

খ. ছত্রমাণিক্য চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, রাজ্যশাসনকার্যের তুমি কী জানো?এ-সব বিষয় তুমি কিছু বোঝ না।" (পৃ. ১৬৮)

ঈ. জয়সিংহ:— ..."আমার স্নেহে— পিতা, আমি অপদার্থ— আমার স্নেহে তুমি একটি পিপীলিকারও হানি করিতে পারিবে না। আমার প্রতি স্নেহে তুমি যদি পাপে লিপ্ত হও, তবে তোমার সে স্নেহ আমি বেশিদিন ভোগ করিতে পারিব না, সে স্নেহের পরিণাম কখনোই ভালো হইবে না।" (পৃ. ১১২)

'বউ-ঠাকুরানীর হাট'-এর চরিত্রদের সঙ্গে প্রতিতুলনা করলে বোঝা যায় 'রাজর্ষি'তে এসে রবীন্দ্রনাথ সংলাপ রচনায় অনেকটাই দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। উপন্যাসের সমস্ত চরিত্র যে একইভাবে, একইস্বরে কথা বলতে পারে না, তাদের মেজাজ এবং পরিস্থিতি বদলের সঙ্গে সঙ্গে যে তাদের সংলাপে ব্যবহৃত শব্দবন্ধ, বলবার ধরনেও বদল আসাটা স্বাভাবিক সেটা 'রাজর্ষি'তে এসেই রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন। ফলে পূর্বের উপন্যাসের মতো এই উপন্যাসের সংলাপ সৃষ্টিতেও এসেছে পার্থক্য। প্রতিটি চরিত্র নির্বিশেষে সংলাপ-জ্ঞাপনের রীতি ও শব্দ ব্যবহারে যেমন বদল এসেছে, তেমনই একই চরিত্রের পরিস্থিতি ও মেজাজের পরিবর্তনের প্রভাবও তাদের সংলাপে ফুটে উঠেছে।

গোবিন্দমাণিক্যের সংলাপ বরাবর একই তারে বাঁধা, চরিত্রটি উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রেম-প্রীতি-মৈত্রী-অহিংসার কথা বলে গেছে। তার কর্ম ও ভাবনার যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে তার সংলাপ প্রয়োগে। এদিক থেকে বলা যায় জয়সিংহ যেন গোবিন্দমাণিক্যের কথার প্রতিধ্বনি। একমাত্র এই দুই চরিত্রের ভাষা ব্যবহারের মধ্যে যে প্রচুর মিল রয়েছে তা চরিত্র দুটির উক্ত সংলাপ থেকে উপলব্ধি করা সম্ভব।

অন্যদিকে রঘুপতির অবস্থান গোবিন্দমাণিক্যের সম্পূর্ণ বিপরীতে। চরিত্রটির সংলাপে আগাগোড়া অভিশাপ-রক্ত-হিংসা-প্রতিশোধ এই ধরনের শব্দ ব্যবহারের প্রাচুর্য লক্ষ করা যায়। যদিও উপন্যাসের একদম শেষে গিয়ে যে শান্তির অবস্থান খুঁজে পেয়েছে তা তার সংলাপে ব্যবহৃত শব্দের পরিবর্তন ও সংলাপ জ্ঞাপনের সুরের মধ্যে বিনয়ের প্রতিফলনেই উপলব্ধি করা যায়।

আবার নক্ষত্ররায়ের সংলাপের প্রতি আলোকপাত করলে দেখা যাবে উপন্যাসের শুরু এবং শেষে গিয়ে তার চরিত্রের আমূল বদল তার উক্তির মধ্যে দিয়েই ফুটে ওঠে। যে নক্ষত্র উপন্যাসের সূচনায় ভীরু, অপরিণতমনস্ক ছিল সে-ই ছত্রমাণিক্য নাম নিয়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরে হয়েছে উদ্ধত। তার এই ঔদ্ধত্য তীব্র ভাবে প্রকাশিত হয়েছে রঘুপতির সঙ্গে কথোপকথনকালে। যে নক্ষত্র যুবরাজ হিসেবে রঘুপতির প্রতি অপরিসীম ভয়-ভক্তি-শ্রদ্ধা পোষণ করত সেই নক্ষত্রই রঘুপতিরই সাহায্যে সিংহাসনে বসে তাকেই অপমান করার সুযোগ ছাড়েনি। ক্ষমতায় মদমত্ত হয়ে রঘুপতির প্রতি ভয় ও শ্রদ্ধা পরিণত হয়েছে অবজ্ঞায়, সম্বোধনে 'আপনি'-র প্রয়োগ নেমে এসেছে 'তুমি'-তে।

৩. চোখের বালি:— সন্দর্ভপত্রের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচনা থেকে ইতিমধ্যে জানা গেছে 'রাজর্ষি'-র পরে সময়ের এক দীর্ঘ ব্যবধান নিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি' রচনায় হাত দিয়েছিলেন। এই উপন্যাস থেকে ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের মূল উদ্দেশ্য ছিল চরিত্রদের আঁতের কথা বিশ্লেষণ। চরিত্রদের মনোজগতের নানান অভিসন্ধির আখ্যানকে ফুটিয়ে তোলাই যেখানে প্রধান হল সেখানে ঘটনার প্রাধান্য কমে যেতেই গুরুত্ব পেতে থাকল সংলাপ গঠনের নানা কৌশল। ইতিপূর্বে রচিত হওয়া উপন্যাসগুলিতে নাটকের আকারে রচিত হওয়া সংলাপ বস্তুতপক্ষে পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকের প্রভাবের কথা মনে আনলেও 'চোখের বালি' থেকে যখন স্থানবিশেষে সংলাপ সাজানো হচ্ছে নাটকের আকারে তখন আসলে চরিত্রদের মধ্যে ঘটে চলা নাট্যদ্বন্দ্বকে বোঝানোর খাতিরেই তা করা হয়েছে। যেমন উল্লেখ করা যায়,

> 'মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা যাও, কিন্তু তোমার চোখের আড়ালে আমি যদি নষ্ট হইয়া যাই, তাহা হইলে কী হইবে?

আশা কহিল, "তোমার আর অত ভয় দেখাইতে হইবে না, আমি কিনা ভাবিয়া অস্থির হইতেছি?

মহেন্দ্র। কিন্তু ভাবা উচিত। তোমার এমন স্বামীটিকে যদি অসাবধানে বিগড়াইতে দাও, তবে এর পরে কাহাকে দোষ দিবে? আশা। তোমাকে দোষ দিব না, সেজন্য তুমি ভাবিয়ো না। মহেন্দ্র। তখন নিজের দোষ স্বীকার করিবে? আশা। একশোবার।" (পৃ. ২৪৭) — নাট্যদ্বন্দ্ব

আশা এবং মহেন্দ্রের মধে চলা এই সংলাপের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করতে গেলে বোঝা যাবে মহেন্দ্র তার মনের অবচেতন এবং অচেতন স্তরে নিমজ্জিত থাকা বিনোদিনীর প্রতি যৌন-তাড়না এবং সেই তাড়না জনিত পাপ-বোধের দায় দুইই আশার ওপর ন্যস্ত করে সে নিজের অবদমিত ইচ্ছাকে লাগামহীন করে তুলতে চেয়েছে। অংশটির পূর্ব এবং পর-পর্যায়ের পরিচ্ছেদগুলির মনোযোগী পাঠে বোঝা যায়, স্বামী-স্ত্রীর এই নিভৃত সংলাপ বিনিময়ের মধ্যে গড়ে তোলা নাট্যদ্বন্দ্বটি প্রকৃতপক্ষে ছদ্ম-দ্বন্দ্ব। এবং এই ছদ্ম-দ্বন্দ্বটি গড়েও উঠেছে মহেন্দ্রের দিক থেকেই।

এইরকমই আরও একটি নাট্যদ্বন্দ্বযুক্ত সংলাপগুচ্ছের উদাহরণ দিয়ে আমাদের বক্তব্যকে আরও স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হবে। উপন্যাসের ২৯ নং পরিচ্ছেদে দেখা যায় বিহারীকে নিমন্ত্রণ জানানোর সংবাদ পাবার পরে মহেন্দ্রের অন্তর্দহন একটা অবাঞ্ছিত নাট্যদ্বন্দ্বের জন্ম দেয় যা সংলাপসজ্জার মধ্যে দিয়েই প্রকাশিত হয়েছে;

'বিহারীকে নিমন্ত্রণ! মহেন্দ্রের সর্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ কহিল, "কিন্তু মা, আমি তো থাকিতে পারিব না।"

রাজলক্ষ্মী। কেন।

মহেন্দ্র। আমার যে বাহিরে যাইতে হইবে।

রাজলক্ষ্মী। খাওয়াদাওয়া করিয়া যাস, বেশি দেরি হইবে না।

মহেন্দ্র। আমার যে বাহিরে নিমন্ত্রণ আছে। — নাট্যদ্বন্দ্ব

বিনোদিনী মুহূর্তের জন্য মহেন্দ্রের মুখে কটাক্ষপাত করিয়া কহিল, "যদি নিমন্ত্রণ থাকে, তা হইলে উনি যান-না, পিসিমা। নাহয় আজ বিহারী ঠাকুরপো একলাই খাইবেন।"(পৃ. ২৬১)

এই যে মহেন্দ্র আবার একটা নাট্যদ্বন্দ্ব গড়ে তুলছিল তার সবটাই যে ছদ্ম সেটা বুদ্ধিমতী বিনোদিনীর চোখ এড়ায়নি এবং সে যে এই ছদ্ম নাট্যদ্বন্দ্বের ফাঁকিটা ধরে ফেলেছে সেটা বুঝিয়ে দিতেই নাট্যাকারে সজ্জিত সংলাপের ধারা ভেঙে দিয়ে সর্বজ্ঞকথক বিনোদিনীর উপস্থিতি এবং তার শারীর-ক্রিয়া সম্পর্কে মন্তব্য গড়ে তোলেন। চরিত্রদের আঁতের কথা বোঝার জন্য তাদের মধ্যে চলতে থাকা ছদ্ম এবং প্রকৃত দ্বন্দ্বগুলিকে বোঝাতেই উপন্যাসের স্থানে স্থানে নাটকের আকারে সংলাপ সাজানো হয়েছে।

চরিত্রদের এই মনস্তাত্ত্বিক দ্বান্দ্বিকতার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল দ্বন্দ্বটা যার দিক থেকে গড়ে উঠছে সেই চরিত্র তার সঙ্গে সংলাপরত অপর চরিত্রটির ভাষা-ব্যবহারের অনুকৃতি করে। এই অনুকৃতি কখনও শব্দ-বন্ধের হতে পারে আবার কখনও বাক্যাংশের হতে পারে। যেমন উল্লেখ করতে পারি;

'রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রকে ধরিয়া পড়িলেন, "বাবা মহিন, গরিবের মেয়েটিকে উদ্ধার করিতে হইবে। শুনিয়াছি মেয়েটি বড়ো সুন্দরী, আবার মেমের কাছে পড়াশুনাও করিয়াছে— তোদের আজকালকার পছন্দর সঙ্গে মিলিবে।"

মহেন্দ্র কহিল, "মা, আজকালকার ছেলে তো আমি ছাড়াও আরও ঢের আছে।"

রাজলক্ষ্মী। মহিন, ঐ তোর দোষ, তোর কাছে বিয়ের কথাটি পাড়িবার জো নাই।"

মহেন্দ্র। মা, ও কথাটা বাদ দিয়াও সংসারে কথার অভাব হয় না। অতএব ওটা মারাত্মক দোষ নয়।" (পৃ. ১৮৯)

অপর চরিত্রের ভাষা-ব্যবহারের অনুকৃতির এই স্বভাব সাধারণভাবে মহেন্দ্র চরিত্রের মধ্যেই দেখা যায়। যদিও বিহারী-বিনোদিনীর দ্বন্দ্বমুখর কথোপকথনের মধ্যেও কিছু ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্যটি পরিলক্ষিত হয়।

..."কী ঠাকুরপো, একেবারে চিনিতেই পার না নাকি।"

বিহারী কহিল, "সকলকেই কি চেনা যায়?"

বিনোদিনী কহিল, "একটু বিবেচনা থাকিলেই যায়।"

উপন্যাসটির সংলাপের ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্যটির প্রসঙ্গ মাথায় রেখে মহেন্দ্র ব্যতীত অপর চরিত্রগুলির সংলাপের প্রতি আলোকপাত করা যেতে পারে।

অ. রাজলক্ষ্মী:— ক. ফোঁস করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কী গো মেজোঠাকরুন, ছেলের সঙ্গে লাগালাগি করিতেছিলে বুঝি?" (পৃ. ১৯১)

খ. ...রাজলক্ষ্মী ভর্তসনা করিয়া বলিতেন, "মহিন ডাকিতেছে, সে বুঝি আর কানে তুলিতে নাই। বেশি আদর পাইলে শেষকালে এমনই ঘটিয়া থাকে..." (পৃ. ২০৮)

গ. ..."আমার এই মাকে তোর হাতে দিয়া গেলাম, মহিন— আমার এই কথাটা মনে রাখিস, তুই এমন লক্ষ্মী আর কোথাও পাবি নে। ..." (পৃ. ৩২৫)

আ. বিনোদিনী:— ক. এমন সুখের ঘরকন্না— এমন সোহাগের স্বামী। এ ঘরকে যে আমি রাজার রাজত্ব, এ স্বামীকে যে আমি পায়ের দাস করিয়া রাখিতে পারিতাম। তখন কি এ ঘরের এই দশা, এ মানুষের এই ছিরি থাকিত। আমার জায়গায় কিনা এই কচি খুকি, এই খেলার পুতুল! (পৃ. ২১০)

খ. জীবনসর্বস্ব, জানি তুমি আমার চিরকালের নও, কিন্তু আজ এক মুহূর্তের জন্য আমাকে ভালোবাসো। তারপরে আমি আমাদের সেই বনে-জঙ্গলে চলিয়া যাইব, কাহারও কাছে কিছুই চাইব না। মরণ পর্যন্ত মনে রাখিবার মতো আমাকে একটা-কিছু দাও। (পৃ. ২৭৭)

ই. আশা:— সে লজ্জায় মরিয়া গিয়া কহিল, "ছি ছি, আজ তিমিএমন প্রশ্ন কেন করিলে। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে খুলিয়া বলো— আমার ভালোবাসায় তুমি কবে কোথায় কী অভাব দেখিয়াছ।" (পৃ. ২৪৩)

'রাজর্ষি' থেকে আরম্ভ করে তাঁর উপন্যাসের ক্ষেত্রে চরিত্র বিশেষে সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে পার্থক্য সৃষ্টি করার যে ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তা অব্যাহত ছিল এই মধ্যপর্বের উপন্যাসগুলিতে। উপন্যাসে রাজলক্ষ্মীর প্রথমদিকের সংলাপের শব্দচয়ন, সংলাপ জ্ঞাপনের সুর এবং তার সঙ্গে কথক নির্দেশিত বাক্যাংশের মধ্যে দিয়ে যেমন চরিত্রটির উগ্র এবং ঈর্ষাপূর্ণ মেজাজের পরিচয় পাওয়া যায় তেমনই উপন্যাসের শেষে গিয়ে মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় তার সংলাপ-জ্ঞাপন এবং সুরের পার্থক্য চরিত্রটির মানসিক বিবর্তনকে সূচিত করে।

অপরদিকে বিনোদিনীর স্বগতোক্তির সাপেক্ষে একই সময়ে বলা তার উক্তিগুলির প্রতিতুলনা করলে বোঝা যায় সে আসলে সর্বক্ষণ অভিনয় করে চলেছে আশা এবং মহেন্দ্রর সঙ্গে। বিহারীর সঙ্গে কিছুসময় পর্যন্ত একটা দ্বান্দ্বিকতার পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলেও সে যখনই বুঝেছে বিহারী তাকে সম্মান করে তখন থেকেই একমাত্র বিহারীর কাছে সে তার প্রকৃত অনুভূতিগুলির প্রকাশ করেছে। কাজেই বিনোদিনীর চরিত্রের যে অনেক স্তর রয়েছে তা তার স্বগতোক্তি, ব্যক্তিবিশেষে সংলাপ ব্যবহারে শব্দচয়নের মধ্যেও ধরা পড়ে।

বোঝা যায় কেন এবং কোন কোন শর্তে ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাস থেকেই পূর্বসূরীদের তুলনায় আধুনিক হয়ে গেলেন। তাঁর ঔপন্যাসিকসত্তার আধুনিকতা শুধু বিনোদিনী চরিত্রের মধ্যেই নয় অথবা আশার ক্রম-বিবর্তনের মধ্যেই নয়, আধুনিকতা রয়েছে সংলাপ রচনা এবং সংলাপ সজ্জার সমান্তরালে সংলাপে ব্যবহৃত শব্দচয়নের মধ্যেও।

৪. নৌকাডুবি:— উপন্যাসটির কাহিনি ও চরিত্র-বিন্যাসের দুর্বলতার প্রতিফলন ঘটেছে উপন্যাসটির সংলাপ গঠনেও। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়,

> রমেশ। আপনার উপদেশ আমি কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিলাম। আমার যাহা কর্তব্য তাহা আমি শীঘ্রই স্থির করিব এবং পালন করিব, এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত হইবেন— এ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই।
>
> অক্ষয়। আমাকে বাঁচাইলেন রমেশবাবু। এত দীর্ঘকাল পরে আপনি যে কর্তব্য স্থির করিবেন এবং পালন করিবেন বলিতেছেন, ইহাতেই আমি নিশ্চিন্ত হইলাম— আপনার সঙ্গে আলোচনা করিবার শখ আমার নাই। ... (পৃ. ৩৫৩)

বোঝা যায় পূর্ববর্তী উপন্যাসের মতো এই উপন্যাসেও চরিত্রদের কথোপকথনকালে নাট্যদ্বন্দ্ব গড়ে তোলা এবং পরস্পরের সংলাপে ব্যবহৃত শব্দবন্ধের পুনঃপ্রয়োগের একটা চেষ্টা ঔপন্যাসিকের মধ্যে কাজ করে গেলেও কাহিনির দুর্বল গঠনের কারণেই সেই চেষ্টা সাফল্য লাভ করতে পারেনি।

৫. গোরা:— ইতিপূর্বে 'চোখের বালি'-র সংলাপ রচনার মধ্যে যে আধুনিকতার সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল তাকেই কিছুটা অগ্রসর করতে রচিত হল 'গোরা'-র সংলাপ। রবীন্দ্রনাথ যে এর বহু আগে থেকেই চলিত ভাষাকে লেখ্যরূপে দেখতে চাইছিলেন তার দৃষ্টান্ত তাঁর পত্রসাহিত্য এবং ব্যক্তিগত চিঠিপত্রগুলি। 'গোরা'-র প্রত্যক্ষ বাচন সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের উল্লেখ করতে হয় তা এর ভাষা ব্যবহার বিষয়ক। খেয়াল করলে দেখা যাবে এই উপন্যাসে বাচন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে চলিত ও সাধু এই দুই ধরনের ভাষারই ব্যবহার করা হয়েছে। উপন্যাসের সমগ্র সংলাপ অংশ বা প্রত্যক্ষ বাচন চলিত গদ্যে রচিত হলেও চরিত্রের স্বগতোক্তি ও কথকের বাচনে ব্যবহৃত হয়েছে সাধু গদ্য। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়;

> ক. "এ আমি কোথায় এসেছি" বলিয়া বৃদ্ধ উঠিয়া বসিবার উপক্রম করতেই বিনয় সম্মুখে আসিয়া কহিল, "উঠবেন না — একটু বিশ্রাম করুন, ডাক্তার আসছে।"
>
> তখন তাঁহার সব কথা মনে পড়িল ও তিনি কহিলেন, "মাথার এইখানটায় একটু বেদনা বোধ হচ্ছে, কিন্তু গুরুতর কিছুই নয়।" (পৃ.৫১০)
>
> খ. ভাবিতে লাগিলেন— 'মা গো, মানুষের ইহাতে যে এমন করিয়া প্রবৃত্তি হইতে পারে তাহা আমি ভাবিয়া পাই না। ব্রাহ্মণের ঘরে তো জন্ম বটে!' (পৃ. ৬৭৪)

সাধু আর চলিত ভাষার সাধারণ পার্থক্য ধরা পড়ে তাদের ক্রিয়া এবং সর্বনামপদের রূপ বদলের মধ্যে। উক্ত অংশের প্রতি মনোনিবেশ করলেই বুঝতে পারা যায় সেই দুই ক্ষেত্রের পার্থক্য উপন্যাসটির ভাষায় যথেষ্ট পরিমাণে বিরাজমান। এই উপন্যাসের প্রত্যক্ষ বাচন সম্পর্কে আলোচনাকালে আরো একটি তথ্যের অবতারণা না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আলোচনাক্ষেত্রে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছিল উপন্যাসটির প্রত্যক্ষ বাচন রচনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে চলিত গদ্য। কিন্তু শুধুমাত্র একটি সংলাপ ছাড়া। সেই একটিমাত্র সংলাপে ব্যবহার করা হয়েছে সাধু গদ্য। কেন এই একটিমাত্র প্রত্যক্ষ সংলাপে সাধুগদ্য ব্যবহার করা হল তার সম্ভাব্য কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে প্রথমে সংলাপটির উল্লেখ প্রয়োজন;

> "গোরার প্রত্যহ সকালে একটা নিয়মিত কাজ ছিল। সে পাড়ার নিম্নশ্রেণীর লোকদের ঘরে যাতায়াত করিত। ...

> নন্দর বাপ বা অন্য পুরুষ অভিভাবক বাড়িতে নাই। পাশে একটি তামাকের দোকান ছিল তাহার কর্তা আসিয়া কহিল, "নন্দ আজ ভোরবেলায় মারা পড়িয়াছে, তাহাকে দাহ করিতে লইয়া গেছে।" (পৃ. ৫৬৭)

এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে সমগ্র উপন্যাসের মধ্যে কেন এই একটিমাত্র সংলাপ সাধু গদ্যে রচিত হল। এর কারণ হিসেবে ভাবা যায় শ্রেণি বিভাজন ('Class Discrimination')-কে। উক্ত অনুচ্ছেদের আরম্ভেই কথক জানিয়ে দিয়েছেন গোরা প্রতিদিন সকালে 'নিম্নশ্রেণীর' লোকেদের ঘরে যেত। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ জমিদারীর কাজে দীর্ঘ দীর্ঘ কাল পূর্ববঙ্গের জলা-জঙ্গল অধ্যুষিত গ্রাম্য পরিবেশে কাটিয়েছেন এবং এরই সমান্তরালে ভুলে যাওয়া যায় না রবীন্দ্রনাথের নিজের বাসভবন অর্থাৎ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির চিতপুরের অবস্থানকে, যার পারিপার্শ্বিকে ছিল 'নিম্নশ্রেণীর'ই বাস। কাজেই এই শ্রেণির মুখের ভাষা রবীন্দ্রনাথ জানতেন না— এই ধরনের মন্তব্য এক্ষেত্রে অনুপযোগী। তবে যে শ্রেণি বিভাজনের ('Class Discrimination')- প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে সেই দিক থেকে ভাবতে গেলে দেখা যাবে ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের সংশয় ছিল এই শ্রেণি বিভাজন নিয়েই। সমাজের একজন তথাকথিত নিম্নশ্রেণির মানুষ, যে পেশায় তামাক বিক্রেতা সে তাদের 'দাদাঠাকুর'কে (গোরা) কীভাবে নন্দর মৃত্যু সংবাদ জানাবে, তার ভাষা কী হবে এই সংশয়ের বিন্দু থেকেই সমগ্র উপন্যাসের সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে এই একটিমাত্র সংলাপে সাধু গদ্যের ব্যবহার করেছেন ঔপন্যাসিক।

এবারে আমরা চরিত্র বিশেষের সংলাপ প্রয়োগের বিষয়টির উপর আলোকপাত করতে পারি।

> **অ. গোরা:—** ..."এই যেখানে আমরা পড়ছি শুনছি, চাকরির উমেদারি করে বেড়াচ্ছি, দশটা-পাঁচটার ভূতের খাটুনি খেটে কী যে করছি তার কিছুই ঠিকানা নেই, এই জাদুকরের মিথ্যে ভারতবর্ষটাকেই আমরা সত্য ব'লে ঠাউরেছি বলেই পঁচিশ কোটি লোক মিথ্যে মানকে মান ব'লে, মিথ্যে কর্মকে কর্ম ব'লে দিনরাত বিভ্রান্ত হয়ে বেড়াচ্ছি— এই মরীচিকার ভিতর থেকে কি আমরা কোনোরকম চেষ্টায় প্রাণ পাব! আমরা তাই প্রতিদিন শুকিয়ে মরছি। একটি সত্য ভারতবর্ষ আছে— পরিপূর্ণ ভারতবর্ষ, সেখানে স্থিতি না হলে আমরা কি বুদ্ধিতে কি হৃদয়ে যথার্থ প্রানরসটা টেনে নিতে পারব না। (পৃ. ৫২১)

আ. বিনয়:— ...আমি বলছি এটা সত্য যে, স্বদেশের মধ্যে মেয়েদের অংশকে আমাদের চিন্তার মধ্যে আমরা যথার্থপরিমাণে আনি নে। তোমার কথাই আমি বলতে পারি, তুমি মেয়েদের সম্বন্ধে এক মুহূর্তও ভাব না— দেশকে তুমি যেন নারীহীন করে জান— সেরকম জানা কখনোই সত্য জানা নয়। (পৃ. ৫৭১-৭২)

ই. সুচরিতা:— সুচরিতা কহিল, "আপনি বলতে চান, ভারতবর্ষের ধর্মতন্ত্র একটি বিশেষ পথ দিয়ে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়। সেই বিশেষত্বটি কী?" (পৃ. ৫৮৯)

ঈ. ললিতা:— ..."সেটা ভ্রম নয়। কিন্তু তা নিয়ে ঝগড়া কিসের? আপনি কেন মনে করছেন আপনাকে এইটেতে রাজি করবার জন্যে আমি মস্ত একটা লড়াই বাধিয়ে দিয়েছি, আপনি সম্মত হওয়াতেই আমি কৃতার্থ হয়েছি! আপনার কাছে অভিনয় করাটা যদি অন্যায় বোধ হয় কারও কথা শুনে কেনই বা তাতে রাজি হবেন?" (পৃ. ৫৯৯)

উ. পরেশবাবু:— "...কোনো মানুষের সঙ্গে সমাজের যখন বিরোধ বাধে তখন দুটো কথা ভেবে দেখবার আছে, দুই পক্ষের মধ্যে ন্যায় কোন দিকে এবং প্রবল কে। সমাজ প্রবল তাতে সন্দেহ নেই, অতএব বিদ্রোহীকে দুঃখ পেতে হবে।" (পৃ. ৭৩৬)

ঊ. আনন্দময়ী:— আমি রাগ করব! তুই বলিস কী! তুই যা করছিস এ তুই জ্ঞানে করছিস নে, তা আমি তোকে বলে দিলুম। আমার মনে এই কষ্ট রইল যে তোকে মানুষ করলুম বটে, কিন্তু—যাই হোক গে, তুই যাকে ধর্ম বলে বেড়াস সে আমার মানা চলবে না— নাহয়, তুই আমার ঘরে আমার হাতে নাই খেলি— কিন্তু তোকে তো দু'সন্ধে দেখতে পাব, সেই আমার ঢের। (পৃ. ৫১৮)

ঋ. পানুবাবু:— হারান কহিল, "বাঙালিরই দোষ। আমাদের এত কুসংস্কার ও কুপ্রথা যে, আমরা ইংরেজদের সঙ্গে মেলবার যোগ্যই নই।" (পৃ. ৫৮৬)

এ. বরদাসুন্দরী:— "...আপনি কি আমাদের উপকার করবার জন্যে দয়া করে আমার মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছেন?" (পৃ. ৬৯৮)

ঐ. হরিমোহিনী:— ক. ..."অমন করে বলিস নে, বলিস নে। তোর কথা শুনলে আমার এত আনন্দ হয় যে আমার ভয় করতে থাকে।" (পৃ. ৬৫২)

খ. ভাবিতে লাগিলেন— 'মা গো, মানুষের ইহাতে যে এমন করিয়া প্রবৃত্তি হইতে পারে তাহা আমি ভাবিয়া পাই না। ব্রাহ্মণের ঘরে তো জন্ম বটে!' (পৃ. ৬৭৪)

চরিত্র বিশেষে যদি আমরা সংলাপের প্রতি আলোকপাত করতে চাই তাহলে দেখব গোরার যে সমস্ত অস্তিত্ব দেশপ্রেমকে কেন্দ্র করে জেগে রয়েছে তা তার প্রতিটি সংলাপ থেকে বোঝা যায়। তার নিত্যদিনকার সাধারণ কথোপকথনের মধ্যেও ভারতবর্ষের চিরন্তনত্বের প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য কোনো বিষয় সেভাবে প্রাধান্য পায় না। এমনকি দেশ নিয়ে

অত্যন্ত আবেগী এই চরিত্র অন্য কোনো বিষয়ে আলোচনাতেও সেভাবে দক্ষ নয়। তার প্রেম, রাগ, অভিমান সমস্তই দেশকে কেন্দ্র করে প্রকাশ পায়। এছাড়াও বিশেষ করে গোরার সংলাপের একটি বৈশিষ্ট্য হল তার সংলাপগুলির সিংহভাগই দীর্ঘ। নিজের মতো ও ভাবনা প্রকাশ করা ও ছড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতা থেকে সে যখনই কথা বলে তখনই দেশ নিয়ে তার আবেগের প্রস্ফুরণে সংলাপগুলি দীর্ঘ হয়ে যায়।

অপরদিকে বিনয়ের প্রতিটি সংলাপকে পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় গোরার তুলনায় সে অনেক বেশি বাস্তববোধ সম্পন্ন। সেও আবেগপ্রবণ, কিন্তু সে যেমন দেশকে বোঝে, তেমনই আনন্দময়ীর চাপা যন্ত্রণা বোঝে, ললিতার অভিমান বোঝে। ভালোবাসার প্রকাশও তার সাধারণ মানুষের মতোই।

পরেশবাবু আর আনন্দময়ীর চরিত্রের ধাতুগত মিল ফুটে উঠেছে চরিত্রগুলির প্রতিটি সংলাপের মধ্যেই। একদিকে আনন্দময়ী যেমন বিশেষ কোনো ধর্মের বন্ধন থেকে নিজেকে অব্যাহতি দিয়েছে তেমনই পরেশবাবু নিজের নিরাকার বিশ্বাসকে কারো উপর চাপিয়ে দিতে চায়নি। দুটি চরিত্রের সংলাপে ব্যবহৃত শব্দবন্ধ, কথার প্রক্ষেপণের মিল যেমনভাবে চরিত্র দুটিকে সমগোত্রীয় করেছে তেমনই পানুবাবু, বরদাসুন্দরী কিংবা হরিমোহিনী সমগোত্রের। এই তিন চরিত্রের সংলাপে ব্যবহৃত শব্দবন্ধ নিশ্চয়ই আপাতভাবে পৃথক গোত্রের। কারণ পানুবাবু শিক্ষিত, বরদাসুন্দরী স্বল্পশিক্ষিত আর হরিমোহিনী অক্ষরজ্ঞানহীন। কিন্তু চরিত্রগুলির সংলাপের ধারাবাহিকতার প্রতি আলোকপাত করলে দেখা যাবে বরাবর এদের একটা প্রবণতা কাজ করেছে নিজেদের বিশ্বাস শুধু অপরের উপর চাপিয়ে দেওয়াই শুধু নয়, বরং সেই দাবি নিয়ে অপরকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করা। এদিক থেকে হরিমোহিনীর সংলাপের একটা বিবর্তন চোখে পড়ে। যখন সে পরেশবাবুদের আশ্রিতা তখন তার বিনয়, আর্থিক দৈন্য সবই তার কথা বলবার ধরনের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছিল, কিন্তু যখন থেকে সে সুচরিতাকে নিয়ে সুচরিতার নিজস্ব বাড়িতে গিয়ে উঠেছে তখন থেকেই তার বিষয়-বাসনা, ধর্মীয় আগ্রাসন উলঙ্গ হয়ে ফুটে উঠেছে তার সংলাপের মধ্যে দিয়ে।

আবার সুচরিতা আর ললিতার স্বভাবগত ভিন্নতাও তাদের সংলাপের মধ্যে দিয়েই প্রকাশিত হয়। সুচরিতার শান্ত-কোমল স্বভাব ও বাক্যবিন্যাসের বিপরীতে অবস্থান করে ললিতার সোজাসাপ্টা কঠিন বাকভঙ্গি।

৬. চতুরঙ্গ:— এই উপন্যাসের প্রত্যক্ষ বাচনের উদাহরণ এবং সে সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় মনে রাখতে হয় এবং তা হল এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ পূর্ববর্তী উপন্যাস রচনার প্রচলিত গঠনের থেকে সরে এসে কাহিনি বর্ণনা করলেন আখ্যানেরই এক চরিত্রের দ্বারা, এবং এই আখ্যানকথন যে আত্মকথনরীতির সমান্তরালে ডায়ারি ধর্মীতা গ্রহণ করেছে সে বিষয়ে পূর্বে তৃতীয় অধ্যায়ে এবং এই অধ্যায়েরও 'কথনরীতি' পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনার করা হয়েছে। কাজেই এই উপন্যাসের সম্পূর্ণ কথন, সংলাপ সবই যে শ্রীবিলাসের ডায়ারি মারফৎ পাওয়া যাচ্ছে সে বিষয়ে দ্বিমত থাকার কথা নয়। আবার শ্রীবিলাস নিজে এই ডায়ারি লিখছে দামিনীকে দাহ করে আসার পরের সময়ে। তার নিজের বয়ান থেকেই পাঠক জানতে পারছে আখ্যানে বর্ণিত বেশ কিছু ঘটনা শচীশের সঙ্গে তার পরিচয়ের পূর্বে ঘটে গিয়েছে। কাজেই বোঝা যায় এই উপন্যাসের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ দুই ধরনের বাচনের মধ্যেই প্রাধান্য পায় শ্রীবিলাসের নিজের বয়ান অংশই, কারণ শ্রীবিলাস একাধারে আখ্যানের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র এবং আবার আখ্যান কথকও বটে। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়,

> "আমি বলিলাম, তুমি যাহাকে প্রকৃতি বলিতেছ সেটা তো একটা প্রকৃত জিনিস; তুমি তাকে বাদ দিতে গেলেও সংসার হইতে সে তো বাদ পড়ে না। অতএব, সে যেন নাই এমন ভাবে যদি সাধনা করিতে থাক তবে নিজেকে ফাঁকি দেওয়া হইবে; একদিন সে ফাঁকি এমন ধরা পড়িবে তখন পালাইবার পথ পাইবে না।" (পৃ. ৮২২)

আবার আমরা যখন সচেতনভাবে উল্লেখ করি যে 'চতুরঙ্গ' আসলে শ্রীবিলাসেরই ডায়ারি তখন বুঝতে হয় আখ্যানে একমাত্র শ্রীবিলাসের নিজের সংলাপগুলি ছাড়া বাকি সমস্ত চরিত্রদের সংলাপই উঠে এসেছে শ্রীবিলাসের স্মৃতি থেকে। শচীশ, জ্যাঠামশাই, দামিনী কিংবা অন্যান্য গৌণ চরিত্রদের প্রত্যেককেই কিন্তু শ্রীবিলাসের ডায়ারি মারফতেই পাওয়া যাচ্ছে, একমাত্র শ্রীবিলাস ছাড়া অন্য কোনো চরিত্রের উপস্থিতিই আখ্যানে প্রত্যক্ষ নয়। সরাসরি শ্রীবিলাসের নিজের বাচনগুলি ছাড়া বাকি চরিত্রদের সংলাপকে সেভাবে প্রত্যক্ষ বাচনের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। 'চতুরঙ্গ'-এর প্রত্যক্ষ বাচন সম্পর্কিত আলোচনার

ক্ষেত্রে এই বিষয়টি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিন্দু তা মাথায় রেখেই এই উপন্যাসের বাচনের আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় উপন্যাসের বাকি তিনটি চরিত্রের সংলাপের উল্লেখ করে,

অ. শচীশ:— ক. শচীশ বলিল, যারা নিন্দা করে তারা নিন্দা ভালোবাসে বলিয়াই করে, সত্য ভালোবাসে বলিয়া নয়। (পৃ. ৭৯৯)

খ. ভিতরে ঢুকিয়াই বলিল, যাঁকে আমি খুঁজিতেছি তাঁকে আমার বড়ো দরকার— আর-কিছুতেই আমার দরকার নাই। দামিনী, তুমি আমাকে দয়া করো, তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাও।" (পৃ. ৮৩৬)

গ. শচীশ মাটির দিকে চোখ নামাইয়া বলিল, আমিও অনেক অপরাধ করিয়াছি, সমস্ত মাজিয়া ফেলিয়া ক্ষমা লইব। (পৃ. ৮৩৭)

আ. দামিনী:— তোমরা আমাকে শান্তি দিবে? দিনরাত্রি মনের মধ্যে কেবলই ঢেউ তুলিয়া তুলিয়া পাগল হইয়া আছ, তোমাদের শান্তি কোথায়? জোড়হাত করি তোমাদের, রক্ষা করো আমাকে— আমি শান্তিতেই ছিলাম, আমি শান্তিতেই থাকিব। (পৃ. ৮২০)

ই. জ্যাঠামশাই:— ব্রাহ্মরা নিরাকার মানে, তাহাকে চোখে দেখা যায় না। তোমরা সাকারকে মান, তাহাকে কানে শোনা যায় না। আমরা সজীবকে মানি; তাহাকে চোখে দেখা যায়, কানে শোনা যায়, তাহাকে বিশ্বাস না করিয়া থাকা যায় না। (পৃ. ৮০৩)

উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শচীশের চরিত্রগত বিবর্তন প্রতিফলিত হয়েছে তার সংলাপ জ্ঞাপনের মধ্যেও। আখ্যানের একদম শুরুর দিকের সংলাপগুলি যত স্বল্প পরিসরের, আবেগের অবদমনে স্থির এবং শান্ত সেখানে আখ্যানের মধ্যপরিসরে জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যুর পরে লীলানন্দ স্বামীর আখড়ার ভক্ত শচীশের সংলাপে আবেগের আতিশয্য চোখে পড়ে। এবং উপন্যাসের উপান্তে এসে লীলানন্দ স্বামীর আশ্রম ত্যাগ করে যাওয়ার পরে শচীশের 'সত্য'-কে খুঁজে না পাওয়ার যন্ত্রণা, 'তাঁকে' খুঁজে পাওয়ার সঠিক পথ অন্বেষণের অস্থিরতাও ফুটে উঠেছে তার সংলাপেই।

আবার দামিনী যে আগাগোড়াই বিদ্রোহী মূর্তিতে আসীন তা তার প্রতিটি সংলাপ থেকে উপলব্ধি করা যায়। সমস্ত অপ্রাপ্তির ক্ষোভ তার সংলাপ জ্ঞাপনের স্বরের মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে। জগমোহনকে আমরা প্রত্যক্ষভাবে আখ্যানের যেটুকু অংশে পাই তাতে তার

প্রতিটি সংলাপের মধ্যে দিয়ে পরোপকারী না-ঈশ্বরে বিশ্বাসী মানসিকতার প্রতিফলন দেখা যায়।

৭. ঘরে-বাইরে:— এই উপন্যাসের বাচন সম্পর্কিত আলোচনাকালে প্রথমেই যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির উল্লেখ করতে হয় তা হল উপন্যাসে আগাগোড়া চলিত ভাষা ব্যবহারের প্রসঙ্গ। ইতিপূর্বে 'গোরা'র আলোচনাকালে দেখা গিয়েছিলো সেখানে সাধু এবং চলিত এই দুই ধরনের গদ্যেরই ব্যবহার রয়েছে। উপন্যাসটির সংলাপ অংশ চলিত গদ্যতে রচিত হলেও সর্বজ্ঞকথকের কথন অংশ রচিত হয়েছে সাধুগদ্যতেই। আবার 'গোরা' থেকে ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে বদল ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ এনেছিলেন তা অব্যাহত ছিল উপন্যাস রচনার শেষকাল পর্যন্ত। এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতেও পারে 'গোরা'-তে সংলাপ রচনায় চলিত গদ্যের ব্যবহার হলেও 'চতুরঙ্গ'-তে পুনরায় সাধুগদ্যের ব্যবহার সর্বাঙ্গীনরূপে ফিরে এসেছে। যদিও এই সাধু গদ্য প্রকৃতিতে যে কোনোভাবেই বঙ্কিমী-সাধুগদ্যের সমগোত্রীয় নয় তা বিভিন্ন সময়ে বহু রবীন্দ্র-গবেষক আলোচনা করে গেছেন এবং আমরাও দ্বিতীয় অধ্যায়ে সে সম্পর্কে আলোচনা করেছি। 'গোরা'-র সময় থেকে চলে আসা ভাষাগত বদলই চরম রূপ নেয় 'সবুজ পত্র'- পত্রিকার প্রভাবে, রচিত হয় ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের চলিত গদ্যে লেখা প্রথম উপন্যাস 'ঘরে-বাইরে'। যে বিন্দুতে গিয়ে 'চতুরঙ্গ'-এর প্রত্যক্ষ বাচনের আলোচনা শেষ হয় সেই বিন্দু থেকেই আরম্ভ করা যায় 'ঘরে-বাইরে'-র বাচনের আলোচনা। এর কারণ এই দুই উপন্যাসেই গ্রহণ করা হয়েছে ডায়ারিধর্ম। পার্থক্য এই যে পূর্ববর্তী উপন্যাসে ডায়ারি লেখক উপন্যাসের একটিমাত্র চরিত্র শ্রীবিলাস, সম্পূর্ণ আখ্যানে প্রত্যক্ষভাবে যাকে পাওয়া যায়। আর 'ঘরে-বাইরে'-তে এসে পালা করে ডায়ারি লিখছে উপন্যাসের তিনটি চরিত্রই। এপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য সেম্যুর চ্যাটম্যানের একটি বক্তব্য,

> "…the correspondent or diarist cannot know how things will ultimately turn out. Nor can he know whether something is important or not. He can only recount the story's past, not its future. He can only have apprehensions or make predictions." (Chatman. 1980. P.171)

চ্যাটম্যানের এই বক্তব্যের নিরিখে বলা যায়, ইতিপূর্বে তৃতীয় অধ্যায়ে আখ্যানের সময়-বিন্যাস সম্পর্কিত আলোচনাকালে দেখানো হয়েছে উপন্যাসের তিনটি চরিত্রের মধ্যে

বিমলার আত্মকথাগুলি লেখা হয়েছে আখ্যানের সমস্ত ঘটনাগুলি ঘটে যাওয়ার পরে কিন্তু সন্দীপ এবং নিখিলেশের আত্মকথাগুলি আখ্যানের ঘটনাকালের সমসাময়িক; কাজেই চ্যাটম্যানের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতাংশের ভিত্তিতে বলা যায় চ্যাটম্যানের বক্তব্য এক্ষেত্রে সন্দীপ এবং নিখেলেশের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা গেলেও বিমলার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না, যেভাবে প্রয়োগ করা যায় না 'চতুরঙ্গ'-এর শ্রীবিলাসের ক্ষেত্রে।

পরপর এই দুটি উপন্যাসের ক্ষেত্রেই ডায়ারি ধর্ম গ্রহণ করা হলেও মোটের ওপর এই উপন্যাসে তিনটি প্রধান চরিত্রকেই আখ্যানদেহে প্রত্যক্ষরূপে পাওয়া যায়। ফলে, এই তিন চরিত্রের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত আত্মকথনে একেকটা ঘটনা একেকভাবে ফুটে উঠেছে যা নিরীক্ষণ শীর্ষক পরিচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার এই পর্বে উপন্যাসের থেকে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করে এই উপন্যাসের প্রত্যক্ষ বাচনের বিষয়টি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করা হবে।

> "আমি জিজ্ঞাসা করলুম, সন্দীপবাবু আর কতদিন এখানে আছেন?
>
> স্বামী বললেন, তিনি কাল সকালেই রংপুরে রওনা হবেন।
>
> কাল সকালেই?
>
> হ্যাঁ, সেখানে তাঁর বক্তৃতার সময় স্থির হয়ে গেছে।" (ঠাকুর। ১৪২৫।পৃ. ৮৫৮) } FDS

উক্ত অংশে প্রত্যক্ষ বাচনের মধ্যেই যে 'মুক্ত প্রত্যক্ষ বাচন' বা Free Direct Speech-র উদাহরণও মিশে রয়েছে সেটুকু নির্দেশ করে দেওয়া গেল। যেহেতু ইতিপূর্বে এই ধরনের বাচনের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে সেহেতু আলোচনার এই অংশে সেই একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করা হল না (বিস্তারিত আলোচনা পৃ. ৬২)।

আবার চরিত্রগুলির সংলাপের প্রতি আলোকপাত করতে গেলে দেখব,

> **অ. বিমলা:—** ...সন্দীপবাবু, আপনি দেশের কী কাজ আছে বলে আমাকে ডেকেছেন, তাই আমার ঘরের কাজ ফেলে এসেছি। (পৃ. ৮৮৬)

> **আ. সন্দীপ:—** ...প্রবৃত্তিই তো প্রকৃতির সেই গ্যাসপোস্ট যার আলোতে আমরা এ-সব রাস্তার খোঁজ পাই। প্রবৃত্তিকে যারা মিথ্যে বলে তারা চোখ উপড়ে ফেলেই দিব্যদৃষ্টি পাবার দুরাশা করে। (পৃ. ৮৭৮)

ই. নিখিলেশ:— ...প্রবৃত্তিকে আমি তখনই সত্য বলে মনে মানি যখন তার সংগে-সঙ্গেই নিবৃত্তিকেও সত্য বলি। চোখের ভেতর কোনো জিনিস গুঁজে দেখতে গেলে চোখকেই নষ্ট করি, দেখতেও পাই নে। প্রবৃত্তির সঙ্গেই একান্ত জড়িয়ে যারা সব জিনিস দেখতে চায় তারা প্রবৃত্তিকেও বিকৃত করে সত্যকেও দেখতে পায় না। (পৃ. ৮৭৮)

উপন্যাসে দেখি সন্দীপ নিখিলেশের বাচনে রূপকের ব্যবহারের আধিক্যকে কেন্দ্র করে সমালোচনা করেছে। এ কথা ঠিক যে নিখিলেশের সংলাপ রূপক ও অলংকার সমৃদ্ধ, কিন্তু এই বিষয়টিই তার সংলাপকে অন্য দুই চরিত্রের থেকে পৃথক করেছে। তৃতীয় অধ্যায়ে সংস্থান বিন্যাসের আলোচনাতেও আমরা এ বিষয়টির উল্লেখ করেছিলাম। নিখিলেশ আসলে আদ্যোপান্ত ভাবুক এবং আবেগপূর্ণ চরিত্র বলেই তার কথায় রূপক এবং অলংকারের প্রয়োগ রয়েছে।

অপরদিকে যুগপৎ সন্দীপের সংলাপ ও আত্মকথাগুলির প্রতি আলোকপাত করলে দেখা যাবে তার স্বভাবের অনুরূপ সংলাপেও উঠে এসেছে প্রবৃত্তি, কাম, ক্রোধ, লোভ, জোর, ছিনিয়ে নেওয়া এই ধরনের শব্দ ও শব্দবন্ধ।

তুলনায় বিমলার সংলাপে উপন্যাসের শুরু এবং শেষের মধ্যে পার্থক্য গড়ে উঠেছে। প্রথমদিকে যখন সে সন্দীপের মোহে একান্ত আচ্ছন্ন তখন যেমন সে সন্দীপের কথারই প্রতিধ্বনি করেছে, নিখিলেশের সঙ্গে বাক্যালাপ কালেও সেই ধ্বনির রেশ থেকে গেছে; কিন্তু উপন্যাসের শেষে গিয়ে যখন সে একই সঙ্গে সন্দীপ এবং নিজের ভুল ও স্বরূপ দুই-ই উপলব্ধি করেছে তখনই যেন বিমলার সংলাপ থেকে প্রকৃত স্বর শুনতে পাওয়া সম্ভব হয়। এই শেষের দিকের সংলাপগুলির স্বরের মধ্যে যে পেলবতা রয়েছে তার সঙ্গে মিল পাওয়া যায় তার প্রথম আত্মকথার প্রথম স্তবকটির।

৮. যোগাযোগ:— 'ঘরে-বাইরে' থেকে যে চলিত গদ্যের ব্যবহার শুরু হয়েছিল তা যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ উপন্যাস পর্যন্ত অব্যাহত রেখেছিলেন তা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। 'ঘরে-বাইরে'-র প্রায় চোদ্দো বছর পরে 'যোগাযোগ' রচিত হওয়ার ফলে এই উপন্যাসে ব্যবহৃত চলিত গদ্য অনেকখানি সহজ হয়ে এসেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'ঘরে-বাইরে' থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে আরও যে একটি বিষয়ের যোগ হল তা মুক্ত প্রত্যক্ষ বাচনের ব্যবহারের প্রাচুর্য। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়,

'কুমুদিনী ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "ছোড়দাদার অসুখ করে নি তো?"

"না, সে ভালোই আছে।"

"চিঠিতে কী লিখেছেন বলো-না দাদা।"

"পড়াশুনোর কথা।" (পৃ. ৯৭৯)

} FDS/Free Direct Speech

প্রত্যক্ষ বাচনের মধ্যে মুক্ত প্রত্যক্ষ বাচনের এই বিগর্ভিত রূপ প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্র-উপন্যাসের গঠনগত আধুনিকতার বার্তা বহন করে। এই উপন্যাসের প্রত্যক্ষ বাচন সম্পর্কে আলোচনাকালে উল্লেখ করতে হয় চরিত্র বিশেষে এই উপন্যাসেও সংলাপ রচনার ধরনের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

উপন্যাসের প্রধান তিনটি চরিত্রের সংলাপের উপর আলোকপাত করলে দেখা যায় কুমুর প্রথম দিকের সংলাপগুলি যেমন আকারে ছোটো তেমনই তার সেই সময়কার স্বগতোক্তিগুলি দীর্ঘ। এবং এই দীর্ঘ স্বগতোক্তির সিংহভাগ জুড়ে থাকে তার আরাধ্যের কীর্তন অথবা শাস্ত্র-বাক্য।

অ. কুমুদিনী:— ক. দাসী! মনে পড়ল রঘুবংশের ইন্দুমতীর কথা—

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ—

ফর্দের মধ্যে দাসী তো কোথাও নেই। সত্যবানের সাবিত্রী কি দাসী? কিংবা উত্তররামচরিতের সীতা?

কুমু বললে, "স্ত্রী যাদের দাসী তারা কোন জাতের লোক?" (পৃ. ১০০৭)

খ. ..."আমাকে ওরা ইচ্ছে করে দুঃখ দিয়েছে তা মনে কোরো না। আমাকে সুখ োরা দিতে পারে নাআমি এমনি করেই তৈরি। আমিও তো ওদের পারব না সুখী করতে। যারা সহজে ওদের সুখী করতে পারে তাদের জায়গা জুড়ে কেবল একটা-না-একটা মুশকিল বাধবে। তা হলে কেন এ বিড়ম্বনা? সমাজের কাছ থেকে অপরাধের সমস্ত লাঞ্ছনা আমিই একলা মেনে নেব, ওদের গায়ে কোনো কলঙ্ক লাগবে না। কিন্তু একদিন ওদেরকে মুক্তি দেব, আমিওমুক্তি নেব;..." (পৃ. ১০৯১)

আবার উপন্যাসের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার সংলাপগুলি যেমন দীর্ঘ হয়েছে তেমনই সেখানে সংযুক্ত হয়েছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বোধ। কাজেই স্মিতবাক অন্তর্মুখী চরিত্রটির সংসারের জটিলতায় যে বিবর্তন তা তার প্রথম ও শেষদিকের সংলাপের মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে।

আবার বিপ্রদাস সম্পর্কে বলা যায় যেহেতু সে অত্যন্ত একরৈখিক একটি চরিত্র তাই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার সমস্ত সংলাপের সুরটা এক, শব্দবন্ধের ব্যবহারেও পার্থক্য সৃষ্টি হয়নি, যেমন পরিবর্তন হয়নি মধুসূদনের সংলাপেরও।

> **আ. বিপ্রদাস:—** ... "আমার মা যে অপমান পেয়েছিলেন তাতে সমস্ত স্ত্রীজাতির অসম্মান। কুমু, তুই ব্যক্তিগতভাবে নিজের কথা ভুলে সেই অসম্মানের বিরুদ্ধে দাঁড়াবি, কিছুতে হার মানবি নে।" (পৃ. ১০৮১)

> **ই. মধুসূদন:—** ..."তুমি তোমার দাদার চেলা, কিন্তু জেনে রেখো, আমি তোমার সেই দাদার মহাজন, তাকে এক হাটে কিনে আর-এক হাটে বেচে দিতে পারি।" (পৃ. ১০০৬)

মধুসূদন যে শুধুই মহাজন, শুধুই ব্যবসায়ী, অর্থসার একটি চরিত্র তা তার সমস্ত সংলাপের মধ্যে দিয়েই ফুটে ওঠে। খেয়াল করলে দেখব তার সংলাপগুলিতে হুকুম, অর্থ, টাকা, ব্যবসা, মহাজন এধরনের শব্দ প্রয়োগের প্রাচুর্য রয়েছে, যা চরিত্রটির একরৈখিকতাকেও নির্দেশিত করে।

৯. শেষের কবিতা:— 'যোগাযোগ'-এর সঙ্গে একই বছরে প্রকাশিত হওয়া (১৯২৯) এই উপন্যাসের প্রত্যক্ষ বাচন বা সংলাপ নিয়ে আলোচনাকালে একবার ফিরে যেতে হয় সন্দর্ভপত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'শেষের কবিতা' সংক্রান্ত বিদগ্ধজনের নানা মন্তব্য এবং তার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে। মনে করতে হয় বুদ্ধদেব বসুর এই উপন্যাস সম্পর্কিত বিখ্যাত সমালোচনাটি,

> "শেষের কবিতা'র সংলাপ, তাহ'লে, এই কারণে দূষ্য যে, এতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের ভাষা ব্যবহার করেননি, প্রায় সকলের মুখেই অমিত রায়ের বুলি বসিয়েছেন।... তবু, সব সত্ত্বেও একথা এ-কথা মানতেই হয় যে'শেষের কবিতা' শিল্পসৃষ্টি হিশেবে দাঁড়িয়ে আছে তার ভাষারই জন্য।" (বসু। ২০১৩। পৃ.১০০)

অর্থাৎ ইতিপূর্বে রচিত হওয়া উপন্যাসগুলিতে যেখানে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের স্বরের অতিপ্রকটতা সম্পর্কিত সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছিল সেখানে 'শেষের কবিতা'-র সমালোচনা হয়েছিল ঠিক এর বিপরীত স্তর থেকে। উপন্যাসের থেকে উদ্ধৃতির অবতারণা করে এই বিষয়টিকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করা যায়।

ক. "তোমারও ছাতে দক্ষিণে বাতাস বইবে, কিন্তু তোমার নববধূ কি চিরদিনই নববধূ থাকবে।"

টেবিলে প্রবল চাপড় দিতে দিতে উচ্চৈঃস্বরে অমিত বললে, "থাকবে, থাকবে, থাকবে।"

যোগমায়া পাশের ঘর থেকে তাড়াতাড়ি এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "কী থাকবে অমিত। আমার টেবিলটা বোধ হচ্ছে থাকবে না।"

"জগতে যা-কিছু টেকসই সবই থাকবে। সংসারে নববধূ দুর্লভ, কিন্তু লাখের মধ্যে একটি যদি দৈবাৎ পাওয়া যায়, সে চিরদিনই নববধূ।"

"একটা দৃষ্টান্ত দেখাও দেখি।"
"একদিন সময় আসবে, দেখাব।"
"বোধ হচ্ছে তার কিছু দেরি আছে, ততক্ষণ খেতে চলো।" (ঠাকুর। ১৪২৫। পৃ. ১১৪৬) — FDS

অথবা

খ. ..."বন্যা, ঠিক করে রেখেছি বিয়ের পরে ঐ বাড়িতেই আমরা কিছুদিন এসে থাকব। আমার সেই গঙ্গার ধারের বাগান, সেই ঘাট, সেই বটগাছ, সব মিলিয়ে গেছে ঐ বাড়িটার মধ্যে। তোমার দেওয়া মিতালি নাম ওকেই সাজে।"

"ও বাড়ি থেকে আজ তুমি বেরিয়ে এসেছ মিতা। আবার একদিন যদি ঢুকতে চাও দেখবে, ওখানে তোমাকে কুলোবে না। পৃথিবীতে আজকের দিনের বাসায় কালকের দিনের জায়গা হয় না। ..." (পৃ. ১১৫৩)

উপন্যাসের উদ্ধৃতাংশের প্রথম সংলাপগুচ্ছে স্থান পেয়েছে অমিত এবং যোগমায়ার কথোপকথন এবং দ্বিতীয় সংলাপগুচ্ছে স্থান পেয়েছে অমিত এবং লাবণ্যের কথোপকথন। দুটি ক্ষেত্রেই মুক্ত প্রত্যক্ষ বাচনের প্রয়োগের আধিক্যের পাশাপাশি বোঝা যায় অমিতের স্বরের প্রতিধ্বনি ফুটে উঠেছে লাবণ্যর শেষের মন্তব্যগুলির মধ্যে।

বাকসর্বস্ব চরিত্র অমিতের বাকবিন্যাসের প্রভাব একমাত্র পড়েনি কেটির উপর। উপন্যাসে স্বল্প পরিসরে তাকে পাওয়া গেলেও সংলাপ থেকে শুরু করে ব্যক্তিত্ব সবেতেই চরিত্রটির নিজস্বতা রয়েছে।

> কেটি বললে, "বাজিতে যদিই হারলুম তবে আমার এই চিরদিনের হারের চিহ্ন তোমার কাছেই থাক অমিট। আমার হাতে রেখে একে আমি মিথ্যে কথা বলতে দেব না।" (পৃ. ১১৬৪)

যেখানে কথক নির্দেশিত বাক্যাংশের উল্লেখ না থাকলে উপন্যাসের শেষ পর্বের লাবণ্য বা যোগমায়ার সংলাপকে অমিতের বলে ভুল করবার মতো সম্ভাবনা তৈরি হয় সেখানে কেটির সংলাপ আগাগোড়া স্বতন্ত্র।

১০. দুই বোন:— রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক জীবনের শেষ পর্বে লেখা এই ক্ষুদ্র উপন্যাসগুলির প্রত্যক্ষ বাচনের গুরুত্ব এখানেই যে 'ঘরে-বাইরে' থেকে সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে আখ্যানতত্ত্বের নিরিখে যে মুক্ত প্রত্যক্ষ বাচনের ব্যবহার আরম্ভ করেছিলেন তার ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে একদম শেষের এই উপন্যাসগুলিতে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়,

> সকালের কাজ সেরে শশাঙ্ক বাড়ি ফিরে এসে বললে, "এ কী ব্যাপার।
> পুতুলের বিয়ে নাকি।"
> "হায় রে কপাল, আজ তোমার জন্মদিন, সে কথাটাও ভুলে গেছ?
> যাই বল, বিকেলে কিন্তু তুমি বেরোতে পারবে না।" } FDS
> "বিজনেস মৃত্যুদিন ছাড়া আর কোনো দিনের কাছে মাথা হেঁট করে না।" (পৃ. ১১৮২)

তত্ত্ব নির্ভর সংলাপ সর্বস্ব এই ক্ষুদ্র উপন্যাসটির সমস্যা হল কোনো চরিত্রের সংলাপের মধ্যেই কোনো রকম বিশেষত্ব লক্ষ করা যায় না, সকলে একই শব্দবন্ধ, একই সুরের প্রয়োগে সংলাপ জ্ঞাপন করে।

১১. মালঞ্চ:— 'দুই বোন'-এর আলোচনার সূচনায় মুক্ত প্রত্যক্ষ বাচনের ব্যবহারের আধিক্যের যে প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছিলো তা শেষ পর্বের প্রতিটি উপন্যাসেই অব্যাহত ছিল। উদাহরণস্বরূপ আলোচ্য উপন্যাস থেকে আমরা উল্লেখ করতে পারি,

"রোশনি, শুনে যা।"

"কী খোঁখী।"

"তোদের জামাইবাবু একদিন আমাকে ডাকত 'রঙমহলের রঙ্গিণী।'

দশ বছর আমাদের বিয়ে হয়েছে, সেই রঙ তো এখনো ফিকে হয় নি,

কিন্তু সেই রঙমহল?"

"যাবে কোথায়, আছে তোমার মহল। কাল তুমি সারারাত

ঘুমোও নি, একটু ঘুমোও তো, পায়ে হাত বুলিয়ে দিই।" (পৃ.১২২২) FDS

সংলাপ রচনা করতে গিয়ে প্রত্যক্ষ বাচন দিয়ে আরম্ভটুকু করে মুক্ত প্রত্যক্ষ বাচনের ব্যবহারের আধিক্য বুঝিয়ে দেয় আসলে রবীন্দ্রনাথ সর্বজ্ঞ-কথককে তার সর্বত্র অনায়াস অবস্থানের থেকে সরিয়ে নিতে চাইছিলেন এই শেষের উপন্যাসগুলিতে।

'দুই বোন'-র সংলাপের যে সমস্যা ছিল তা অনেকটা প্রশমিত হয়েছে এই উপন্যাসে। এবং তার অন্যতম কারণ নীরজা চরিত্রটি।

> নীরজা বললে, "মালীকে দোষ দিই নে। নতুন মনিবকে সইতে পারবে কেন। ওদের হল সাতপুরুষের মালীগিরি, আর তোমার দিদিমণির বইপড়া বিদ্যে, হুকুম করতে এলে সে কি মানায়। হলা ছিষ্টিছাড়া আইন মানতে চায় না, আমার কাছে এসে নালিশ করে। আমি বলি কানে নিস নে কথা, চুপ করে থাক।" (পৃ. ১২১৬)

উপন্যাসের কেন্দ্রে থাকা চরিত্রটির মানসিক ও শারীরিক অসুস্থতার প্রতিফলন ঘটেছে তার সংলাপে। উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি সংলাপে ফিরে এসেছে সরলাকে ঘিরে ঈর্ষার ঝঙ্কার।

১২. চার অধ্যায়:— মুক্ত প্রত্যক্ষ বাচনের ব্যবহার প্রকট হয়েছে একদম শেষ উপন্যাস "চার অধ্যায়"-তে এসে। যে-কারণে "চার-অধ্যায়" বহু সমালোচকের মতে নাট্য ধর্মীতা প্রাপ্ত হয়েছে। চারটি অধ্যায়ে একটি করে মাত্র অনুচ্ছেদ ব্যতীত প্রায় সম্পূর্ণ উপন্যাসই গড়ে উঠেছে মুক্ত প্রত্যক্ষ বাচনের ওপর নির্ভর করে। যদিও পরিমাণে স্বল্প হলেও প্রত্যক্ষ বাচনের উদাহরণ একেবারে অলভ্য নয়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়,

'...অতীন্দ্র দমকা হাওয়ার মতো ঘরে ঢুকেই ডাক দিল "এলী।"

এলা খুশিতে চমকে উঠে বললে, "অসভ্য, জানান না দিয়ে এ ঘরে আসতে সাহস কর।"

এলার পায়ের কাছে ধপ করে মেঝের উপর বসে অতীন বললে, "জীবনটা অতি ছোটো, কায়দাকানুন অতি দীর্ঘ, নিয়ম বাঁচিয়ে চলার উপযুক্ত পরমায়ু ছিল সনাতন যুগের মান্ধাতার। কলিকালে তার টানাটানি পড়েছে।"

"আমার কাপড় ছাড়া হয় নি এখনো।"
"ভালোই। তাহলে আমার সঙ্গে মিশ খাবে। ..." (পৃ. ১২৬১) } FDS

এই উপন্যাসটির সংলাপ গঠনের ক্ষেত্রেও সমস্যা এটা যে চরিত্র বিশেষে সংলাপ গঠন যথাযথ হয়নি। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ইন্দ্রনাথ যেভাবে কথা বলে পেশায় চা-বিক্রেতা কানাই গুপ্তও সেই ভাষাতেই কথা বলে।

"ঠাট্টা নয়। আমি তোমাদের রসদ-জোগানদারদের সামান্য একজন। চায়ের দোকানে শনি প্রবেশ করলে, বেরিয়ে পড়লুম। সঙ্গে সঙ্গে চলল ওদের কুদৃষ্টি। শেষকালে ওদেরই গোয়েন্দার খাতায় নাম লিখিয়ে এলুম। নিমতলা ঘটের রাস্তা ছাড়া কোনো রাস্তা নেই যাদের সামনে , তাদের পক্ষে এটা গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, দেশের বুকের উপর দিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত বরাবর লম্বমান।" (পৃ. ১২৭২)

এই সমস্যা আমরা আগেও দেখেছি 'গোরা'-র সংলাপ আলোচনাকালে। পেশা নির্বিশেষে, শ্রেণি নির্বিশেষে চরিত্রদের মুখের ভাষা প্রয়োগ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সংকোচ সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে এই স্বাভাবিকতার অভাব ও বৈচিত্র্যহীনতার সৃষ্টি করেছে। এক্ষেত্রে বরং ব্যতিক্রম এলা আর অতীন্দ্র। কিন্তু চরিত্র দুটির কথোপকথনের মধ্যে কেবলই তাদের আলাপ-পরিচয়কালের প্রসঙ্গ প্রাধান্য পাওয়ার ফলে এই দুই চরিত্রের সংলাপও হয়েছে একইরকম।

গঠনগতভাবে এই শেষের উপন্যাসগুলি প্রচলিত সর্বজ্ঞকথন রীতিতে কথিত হলেও সর্বজ্ঞ-কথকের সর্বজ্ঞতার পরিচয় এখানে এসে বহুলাংশে ক্ষীণ হয়েছে মুক্ত প্রত্যক্ষ বাচনের ব্যবহারের ফলে। নিজেকে ক্রমাগত অতিক্রম করতে চাওয়া রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক সত্তা শেষ পর্বে রচিত উপন্যাসগুলির প্রত্যক্ষ বাচনের মধ্যে বিগর্ভিত মুক্ত

প্রত্যক্ষ বাচনের অতি ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে আসলে উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে নতুন মাত্রার যোগের প্রয়াস করেছেন।

(খ) পরোক্ষ বাচন:— এটি হল কথকের বাচন। আখ্যানভাগে কথক যখন কোনো অংশের বর্ণনা করেন তখন সেটি হয় পরোক্ষ বাচন। পরোক্ষ বাচন বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন- পরিবেশ বর্ণনা, চরিত্রাবলির পরিচয় প্রদান, চরিত্রের বৈশিষ্ট্য উদ্ঘাটন, সারাংশ প্রদান, চরিত্রদের না-ভাবা কথা বলে দেওয়া, টিকা-টিপ্পনী প্রভৃতি (বিস্তারিত আলোচনা পৃ. ৫৫-৫৮)। প্রতীয়মান কথকের প্রতীয়মানতার মাত্রা নির্ণয় করার জন্য চ্যাটম্যান কথকের কথনের ক্ষেত্রগুলিকে যে বিশেষ কিছু ভাগে বিভাজিত করেন সেই বিভাজনের নিরিখে আমরা রবীন্দ্র-উপন্যাসগুলির থেকে উদাহরণ তুলে আলোচনা করে পরোক্ষ বাচন বিষয়টি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব।

১. সংস্থান বর্ণনা:— চ্যাটম্যান কথকের প্রতীয়মানতা নির্ণয় করতে গিয়ে যে নিক্তিগুলি নির্ধারণ করেছিলেন তার মধ্যে প্রথম ছিল কথকের দ্বারা আখ্যানের সংস্থান বর্ণনা। কাজেই পরোক্ষ বাচনের প্রথম শ্রেণি বিভাজনের মধ্যে সংস্থান-বর্ণনার উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়,

> **ক. চোখের বালি':—** "দেয়ালে মহেন্দ্রে যে বাঁধানো ফোটগ্রাফখানি ছিল,তাহার ফ্রেমের চার কোণে রঙিন ফিতার দ্বারা সুনিপুণভাবে চারিটি গ্রন্থি বাঁধা, এবং সেই ছবির নীচে ভিত্তিগাত্রে একটি টিপাইয়ের দুই ধারে দুই ফুলদানিতে ফুলের তোড়া, যেন মহেন্দ্রের প্রতিকৃতি কোনো অজ্ঞাত ভক্তের পূজা প্রাপ্ত হইয়াছে"। ('ঠাকুর। ১৪২৫। পৃ. ২৪৯)
>
> **খ. চতুরঙ্গ:—** "সেদিন প্রায় ছয় ঘন্টা রৌদ্রে হাঁটিয়া আমরা যে জায়গায়াসিয়া পড়িয়াছিলাম সেটা সমুদ্রের মধ্যে একটা অন্তরীপ! একেবারে নির্জন নিস্তব্ধ; নারিকেলবনের পল্লববীজনের সঙ্গে শান্তপ্রায় সমুদ্রের অলস কল্লোল মিশিতেছিল।" (পৃ. ৮১৭)
>
> **গ. যোগাযোগ:—** "খানিকক্ষণের জন্য বৃষ্টি ধরে গেছে। তখনো সব ঘরে আলো জ্বলে নি। আন্দিবুড়ি ধুনুচি হাতে ধুনো দিয়ে বেড়াচ্ছে, একটা চামচিকে উঠোনের উপরের আকাশ থেকে লণ্ঠনজ্বালা অন্তঃপুরের পথ পর্যন্ত কেবলই চক্রপথে ঘুরছে।" (পৃ. ১০৫০)

২. কালিক সংক্ষিপ্তসার:— চ্যাটম্যানের নিক্তিতে কথকের প্রতীয়মানতা নির্ধারিত হয় কথক-কৃত ঘটনার সংক্ষিপ্তসার প্রদানের মাধ্যমেও। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়,

অ. চতুরঙ্গ:— "যথাকালে, অর্থাৎ যথাকালের অনেক পূর্বে, হরিমোহনের বিবাহ হইয়া গেল। তিন মেয়ে, তিন ছেলের পরে শচীশের জন্ম। সকলেই বলিল, জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে শচীশের চেহারার আশ্চর্য মিল। জগমোহনও তাকে এমনি করিয়া অধিকার করিয়া বসিলেন যেন সে তাঁরই ছেলে।" (ঠাকুর। ১৪২৫। পৃ. ৮০১)

আ. যোগাযোগ:— ক. "মোতির মা'র বুঝতে বাকি ছিল না কোন জায়গায় কুমুর দরদ, তাই নানারকম করে ওর দাদার কথাই আলোচনা করলে।" (পৃ. ৯৯৭)

খ. "এর পরে কথাবার্তা যা চলল সে একবারেই কাজের কথা নয়, এ গল্পের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই।" (পৃ. ১০৪৫)

ই. শেষের কবিতা:— "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এ.'র কোঠায় পা দেবার পূর্বেই অমিত অক্সফোর্ডে ভর্তি হয়; সেখানে পরীক্ষা দিতে দিতে এবং না দিতে দিতে ওর সাত বছর কেটে গেল।" (পৃ.১১০৫)

৩. চরিত্রের না বলা বা না ভাবা বিষয়ে বিবরণ দান:— চ্যাটম্যান কথকের প্রতীয়মানতা বিচারকালে সম্ভবত সর্বজ্ঞ-কথকের সর্বজ্ঞতার বিষয়টিকে স্মরণে রেখেই আলোচ্য নিক্তিটির অবতারণা করেছিলেন। আখ্যান কথক অনেক সময়েই আখ্যানের চরিত্রদের না ভাবা অথবা ভাবলেও না বলা কথার বিবরণ দান করেন। ফলে এটিও কথকের বাচন তথা আখ্যানের পরোক্ষ বাচনের ক্ষেত্রেই আলোচিত হয়। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়;

অ. মালঞ্চ:— "দিনের কাজ আরম্ভের পূর্বেই রোজ আদিত্য বিশেষ বাছাই-করা একটি করে ফুল স্ত্রীর বিছানায় রেখে যেত। নীরজা প্রতিদিন তারই অপেক্ষা করেছে। আজকের দিনের বিশেষ ফুলটি আদিত্য সরলার হাতে দিয়ে গেল। এ কথা তার মনে আসে নি যে, ফুল দেওয়ার প্রধান মূল্য নিজের হাতে দেওয়া। গঙ্গার জল হলেও নলের ভিতর থেকে তার সার্থকতা থাকে না।" (ঠাকুর। ১৪২৫। পৃ. ১২১৮)

আ. শেষের কবিতা:— "এতদিনকার নিরুৎসুক দিনরাত্রির দাগ লেগে অমিতর জীবনটা ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল যেন মাস্টারের হাতে ইস্কুলের প্রতি বছর পড়ানো একটা ঢিলে মলাটের টেক্সট বুক। আগামী দিনটার জন্য কোনো কৌতূহল ছিল না, আর বর্তমান

দিনটাকে পুরো মন দিয়ে অভ্যর্থনা করা ওর পক্ষে ছিল অনাবশ্যক। এখন সে এইমাত্র এসে পৌঁছল একটা নতুন গ্রহে; এখানে বস্তুর ভার কম; পা মাটি ছাড়িয়ে যেন উপর দিয়ে চলে যায়; প্রতি মুহূর্তে ব্যগ্র অভাবনীয়ের দিকে এগোতে থাকে; ...” (পৃ. ১১২১)

৪. তত্ত্ব এবং ভাষ্য:— চ্যাটম্যান তত্ত্ব এবং ভাষ্যকে চারটি উপবিভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করেছেন। এগুলি হল—

অ.ভাষ্য:— চ্যাটম্যান আখ্যানে কথকের প্রদত্ত ভাষ্য সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন. বস্তুতপক্ষে কথকের সাধারণ কথন মাত্রই ভাষ্য। আর কথকের ভাষ্যের মধ্যেই কথকের প্রতীয়মানতা সর্বাধিক অনুভূত হয়। আখ্যানে কথকের ভাষ্যের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়;

ক. নৌকাডুবি:— “রমেশ এবার আইন-পরীক্ষায় যে পাস হইবে, সে সম্বন্ধে কাহারও কোনো সন্দেহ ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সরস্বতী বরাবর তাঁহার স্বর্ণপদ্মের পাপড়ি খসাইয়া রমেশকে মেডেল দিয়া আসিয়াছেন— স্কলারশিপও কখনো ফাঁক যায় নাই।

পরীক্ষা শেষ করিয়া এখন তাহার বাড়ি যাইবার কথা। কিন্তু এখনো তাহার তোরঙ্গ সাজাইবার কোনো উৎসাহ দেখা যায় নাই। পিতা শীঘ্র বাড়ি আসিবার জন্য পত্র লিখিয়াছেন। রমেশ উত্তরে লিখিয়াছে, পরীক্ষার ফল বাহির হইলেই সে বাড়ি যাইবে।” (ঠাকুর। ১৪২৫। পৃ. ৩৩৭)

খ. গোরা:— “এমন সময়ে ঠিক তাহার বাসার সামনেই একটা ঠিকাগাড়ির উপরে একটা মস্ত জুড়িগাড়ি আসিয়া পড়িল এবং ঠিকাগাড়ির একটা চাকা ভাঙিয়া দিয়া দৃকপাত না করিয়া বেগে চলিয়া গেল। ঠিকাগাড়িটা সম্পূর্ণ উল্টাইয়া না পড়িয়া এক পাশে কাত হইয়া পড়িল।

বিনয় তাড়াতাড়ি রাস্তায় বাহিত হইয়া দেখিল গাড়ি হইতে একটি সতেরো-আঠারো বৎসরের মেয়ে নামিয়া পড়িয়াছে, এবং ভিতর হইতে একজন বৃদ্ধগোছের ভদ্রলোক নামিবার উপক্রম করিতেছেন।” (পৃ. ৫০৯)

আ. ব্যাখ্যা:— পরোক্ষ বাচনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল কথককৃত ঘটনা বা চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ব্যাখ্যা প্রদান। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির প্রতি আলোকপাত করলে দেখা যাবে তিনি ঘটনা-প্রধান উপন্যাস রচনা ত্যাগ করে দীর্ঘ সময়ের বিরতি নিয়ে যখন

মনস্তত্ত্ব-প্রধান উপন্যাস রচনায় অগ্রসর হলেন তখন থেকে উপন্যাসগুলিতে ঘটনা বা চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কথক-কৃত ব্যাখ্যার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়;

ক. চোখের বালি:— "রাজলক্ষ্মী নিশ্চিন্তচিত্তে বিবাহের দিন স্থির করিলেন। দিন যত নিকটে আসিতে লাগিল, মহেন্দ্রের মন ততই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল— অবশেষে দুই-চার দিন আগে সে বলিয়া বসিল, "না মা, আমি কিছুতেই পারিব না।"

বাল্যকাল হইতে মহেন্দ্র দেবতা ও মানবের কাছে সর্বপ্রকারে প্রশ্রয় পাইয়াছে, এইজন্য তাহার ইচ্ছার বেগ উচ্ছৃংখল। পরের ইচ্ছার চাপ সে সহিতে পারে না। তাহাকে নিজের প্রতিজ্ঞা এবং পরের অনুরোধ একান্ত বাধ্য করিয়া তুলিয়াছে বলিয়াই বিবাহ-প্রস্তাবের প্রতি তাহার অকারণ বিতৃষ্ণা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল এবং আসন্নকালে সে একেবারেই বিমুখ হইয়া বসিল।" (ঠাকুর। ১৪২৫। পৃ.১৮৯)

খ. গোরা:— "গোরা যে ত্রিবেণীতে স্নান করিতে সংকল্প করিয়াছে তাহার কারণ এই যে, সেখানে অনেক তীর্থযাত্রী একত্র হইবে। সেই জনসাধারণের সঙ্গে গোরা নিজেকে এক করিয়া মিলাইয়া দেশের একটি বৃহৎ প্রবাহের মধ্যে আপনাকে সমর্পণ করিতে ও দেশের হৃদয়ের আন্দোলনকে আপনার হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে চায়। ..." (পৃ. ৫২৮)

উদ্ধৃতাংশগুলির মধ্যে দ্বিতীয় বন্ধনীকৃত অংশগুলিতে কথক-কৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে। মহেন্দ্র যে প্রথমাবস্থায় বিনোদিনীর সঙ্গে বিবাহের মাত্র দিন দুই-চার আগে বিবাহ করতে প্রত্যাখ্যান করে তার মধ্যে দিয়ে কথক মহেন্দ্র চরিত্রের সর্বৈব উদাসীন, দায়িত্বজ্ঞানহীনতার প্রতি আলোকপাত করেন। এবং পরক্ষণেই মহেন্দ্রের এহেন দায়িত্বজ্ঞানহীন উদাসীনতার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে উদ্ধৃতাংশের দ্বিতীয় বন্ধনীকৃত অংশটির উল্লেখ করেন যা মহেন্দ্রের নির্দিষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের গড়ে ওঠার কারণ হিসেবে নির্দেশিত হয়েছে। একইরকমভাবে উপন্যাস 'গোরা'-তে গোরার ত্রিবেণীতে গঙ্গাসাগরে স্নানযাত্রার পেছনে থাকা প্রকৃত কারণ যে হিন্দুত্ব নয়, তা যে ভারতীয়ত্বের সঙ্গে এক হতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষাজনিত, সে ব্যাপারে নির্দেশ করেই কথক উক্ত অংশটি উল্লেখ করেছে।

ই. অভিমত:— আখ্যান কথক অনেক সময়েই কথনকালে কিছু ঘটনা অথবা চরিত্রের ক্রিয়াকে সামনে রেখে কিছু অভিমত প্রকাশ করেন যার মধ্যে দিয়ে অনেক সময়েই যুগপৎ নিহিত এবং প্রকৃত লেখকের নৈতিক, আধ্যাত্মিক কিংবা জাগতিক মূল্যবোধের আভাস পাওয়া যায়। উদাহরণ হিসেবে রবীন্দ্র-উপন্যাস থেকে আমরা উল্লেখ করতে পারি;

> **ক. রাজর্ষি:—** "কনকসুধাসিক্ত নীলাকাশে তিনি কাহার অনুপম সুন্দর সহাস্য মুখচ্ছবি দেখিতে পাইলেন। ধ্রুব যেমন তাঁহার কোলে বসিয়া আছে— তাঁহাকেও তেমনই কে যেন বাহুপাশের মধ্যে, কোলের মধ্যে তুলিয়া লইল। তিনি আপনাকে, আপনার চারিদিকের সকলকে, বিশ্বচরাচরকে, কাহার কোলের উপর দেখিতে পাইলেন।" (ঠাকুর। ১৪২৫। পৃ. ১১৫)

> **খ. চতুরঙ্গ:—** "...শচীশের সঙ্গে যারা পড়ে তাদের অনেকেরই তার উপরে একটা বিষম বিদ্বেষ। আসল কথা, যাঁহারা দশের মতো, বিনা কারণে দশের সঙ্গে তাহাদের বিরোধ বাধে না। কিন্তু মানুষের ভিতরকার দীপ্যমান সত্যপুরুষটি স্থূলতা ভেদ করিয়া যখন দেখা দেয় তখন অকারণে কেহ-বা তাঁহাকে প্রাণপণে পূজা করে, আবার অকারণে কেহ-বা তাহাকে প্রাণপণে অপমান করিয়া থাকে। (পৃ. ৭৯৯)

ঈ. সাধারণীকরণ:— কথক অনেক সময়ে কথনকালে কিছু ঘটনা বা চরিত্রকে উপলক্ষ্য করে সাধারণীকৃত মন্তব্য করেন। এবং এই ধরনের সাধারণীকরণের মধ্যেও নিহিত লেখক এবং অনেক সময় প্রকৃত-লেখকের ব্যক্তিগত বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্নটি মিশে যায়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করতে পারি;

> **ক. দুই বোন:—** "মেয়েরা দুই জাতের, কোনো কোনো পণ্ডিতের কাছে এমন কথা শুনেছি।
>
> এক জাত প্রধানত মা, আর-এক জাত প্রিয়া।" (ঠাকুর। ১৪২৫। পৃ. ১১৭৭)

> **খ. গোরা:-** "সাধারণত আমাদের দেশের লোকেরা স্বজাতি ও স্বদেশের আলোচনায় কিছু-না-কিছু মুরুব্বিয়ানা ফলাইয়া থাকে; তাহাকে গভীর ভাবে সত্য ভাবে বিশ্বাস করে না; এইজন্য মুখে কবিত্ব করিবার বেলায় দেশের সম্বন্ধে যাহাই বলুক দেশের প্রতি তাঁহাদের ভরসা নাই; ..." (পৃ. ৫৪২)

(গ) মুক্ত পরোক্ষ বাচন:— মুক্ত পরোক্ষ বাচন বলতে বোঝায় বাচনের সেই অংশকে যেখানে কথকের বাচনের মধ্যে কোনো চরিত্রের সংলাপ বিগর্ভিত হয়। অর্থাৎ এখানে পুরোপুরি পরোক্ষ বাচনকেও পাওয়া যায় না আবার প্রত্যক্ষ বাচনকেও সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যায় না। বস্তুতপক্ষে এটি হল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বাচনের সহাবস্থান। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়;

> **অ. গোরা:—** "বিনয় বলিতে লাগিল, আজকাল তাহার কাছে সমস্ত দিন ও রাত্রির মধ্যে কোথাও যেন কিছু ফাঁক নাই— সমস্ত আকাশের মধ্যে যেন কোনো রন্ধ্র নাই, সমস্ত একেবারে নিবিড়ভাবে ভরিয়া গেছে— বসন্তকালের মউচাক যেমন মধুতে ভরিয়া ফাটিয়া যাইতে চায়, তেমনিতরো।" (পৃ. ৫৫৮)
>
> **আ. ঘরে-বাইরে:—** "আমার স্বামী বরাবর বলে এসেছেন, স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের প্রতি সমান অধিকার, সুতরাং তাদের সমান প্রেমের সম্পর্ক।" (পৃ. ৮৪৯)
>
> **ই. যোগাযোগ:—** "পূর্বোক্ত ছাত্রবন্ধু এসে বললে, নতুন রাজা খোশমেজাজে আছে, এই সময় ওর কাছ থেকে সুবিধেমত ধার পাওয়া যেতে পারে।" (পৃ. ৯৭২)
>
> **ঈ. শেষের কবিতা:—** "অমিত বলে, ফ্যাশানটা হল মুখোশ, স্টাইলটা হল মুখশ্রী। ওর মতে যারা সাহিত্যের ওমরাও-দলের, যারা নিজের মন রেখে চলে, স্টাইল তাদেরই। আর যারা আমলা-দলের, দশের মন রাখা যাদের ব্যাবসা, ফ্যাশন তাদেরই।" (পৃ.১১০৫)

এই যে আখ্যানে মুক্ত পরোক্ষ বাচনের ব্যবহার, তার ফল সম্পর্কে আলোচনাকালে লিচ উল্লেখ করেছেন,

> "...FIS is normally viewed as a form where the authorial voice is interposed between the reader and what the character says, so that the reader is distanced from the character's words." (Leech and Short. 2007. P.268)

অর্থাৎ মুক্ত পরোক্ষ বাচন ব্যবহারের ফলে আখ্যানের চরিত্রদের প্রত্যক্ষ স্বর কথকের স্বরের দ্বারা অবদমিত হয়। চরিত্রের বলা বক্তব্যটি যথাযথভাবে পাঠকের কাছে না পৌঁছে কথকের মাধ্যমে পৌঁছনোর ফলে একটা দ্বৈত স্বরের আভাস গড়ে ওঠে।

‘রবীন্দ্র-উপন্যাসের আখ্যানতাত্ত্বিক বাচনশৈলী’-র আলোচনার শেষ প্রান্তে এসে উপলব্ধি করা যায় যে আসলে কথনরীতি, দৃষ্টিকোণ এবং ভাষা-বিন্যাস এই তিনটি বিষয়ই একে অপরের সঙ্গে বিজড়িত অবস্থায় থাকে। কথকের অবস্থানের ভিত্তিতে যেমন কথনরীতির পার্থক্য গড়ে ওঠে তেমনই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় দৃষ্টিকোণের বিষয়টিও নির্ভর করে এরই উপর। যদিও উপন্যাস ‘চোখের বালি’ থেকে কথকের সমান্তরালে ব্যবহৃত হয়েছে চরিত্রদের পরিবর্তিত দৃষ্টিকোণও। একই রকমভাবে উপন্যাসগুলির প্রথমদিকে প্রত্যক্ষ বাচনের ব্যবহারের আধিক্য যেমন কথকের প্রকট অবস্থানকে নির্দেশ করে তেমনই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ‘চতুরঙ্গ’ থেকে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলা মুক্ত প্রত্যক্ষ বাচনের ব্যবহার এই অবস্থানকে ছদ্ম প্রকৃতির করে তোলে। এই সময় থেকেই চরিত্রদের কথোপকথনের মধ্যে কথকের স্বরকে আড়াল করার তাগিদ থেকেই যে ঔপন্যাসিক এমনটা করেছিলেন তা উপন্যাসগুলির কথনরীতির বিশ্লেষণেও প্রকাশিত হয়েছে। যদিও শুধুমাত্র মুক্ত প্রত্যক্ষ বাচনের ব্যবহারের মাধ্যমেই যে কথকের বা নিহিত লেখকের প্রভাব কমে আসে তা নয়। বরং শেষের ক্ষুদ্রাকার উপন্যাসগুলির প্রায় প্রতিটিতেই ব্যক্তি লেখকের পূর্ব নির্ধারিত এক বা একাধিক তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠার তাগিদের ফলে উপন্যাসগুলি যেমন হয়ে পড়েছে আড়ষ্ট ও কৃত্রিম, তেমনই সমান্তরালভাবে এই তাগিদের মধ্যে দিয়েই প্রকৃত লেখক এবং ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।